পাখির বাসা

সুবোধ বসু

গ্রন্থাগার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৫৫

প্রচ্ছদ চিত্র
শ্রীপ্রিয় গুহ
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিয়ো
মুদ্রাকর
গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
প্রিণ্টক্রাফ্‌ট লিঃ
৬৩ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক
গ্রন্থাগারের পক্ষে
পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা হইতে
শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু

এই উপন্যাসটি 'বর্ত্তমান' মাসিক পত্রে 'নীড়' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল

শ্রীভূপতি চৌধুরী
প্রীতিভাজনেষু

সুবোধ বসু-র

অন্যান্য বই

উপন্যাস

রাজধানী

পদ্মা-প্রমত্তা নদী

মানবের শত্রু নারী

পদধ্বনি

নব মেঘদূত

সহচরী

নটী

স্ত্রী-যুদ্ধ

স্বর্গ

বন্দিনী

গল্প-সংগ্রহ

জয়যাত্রা

বিগত বসন্ত

নাটিকা

অতিথি

কলেবর

তৃতীয় পক্ষ

শিশুনাট্য

বুদ্ধির্যস্য

এক

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি; দার্জ্জিলিং পাহাড়ে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। কিন্তু সপ্তাহব্যাপী একঘেয়ে বর্ষণের পর রবিবারের সূচনা হইতেই সূর্য্য ঠাকুর একগাল হাসিয়া পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া উঁকি মারিয়াছেন। যেন একটা দুষ্টু ইস্কুলের ছেলে রবিবার ইস্কুলে যাইতে হইবে না এই কথাটা স্মরণ করিয়া প্রসন্ন হাস্যে দুই পাটি দাঁতই বাহির করিয়া দিয়াছে। উজ্জ্বল মিঠা রৌদ্রে সারা দার্জ্জিলিং শহর রোমাঞ্চিত হইল। সর্পিল পাহাড়ী রাস্তায় জনতার কল-কোলাহল জাগিয়া উঠিল; ঘোড়-সওয়ারিদের অশ্ব-খুরধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দার্জ্জিলিঙের সরকারী বৈঠকখানা চৌরাস্তার সমতল পৃষ্ঠে নাচ শুরু করিল। পাহাড়ী এবং চেঞ্জে-আসা বাবু নির্ব্বিশেষে সকলেই যেন রৌদ্রের সোনা পান করিয়া বেসামাল হইয়া উঠিয়াছে। সুদূর পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই আনন্দের খবর প্রচারিত হইয়া গেছে। চায়ের বাগানে বাগানে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ষা-সৌভাগ্য স্ফীত পাহাড়ী ঝরনাগুলি খুসিতে করতালি বাজাইল; দীর্ঘ পাইনগাছগুলি প্যারেড-গ্রাউণ্ডের সৈন্যদের মতো সারি দিয়া যেন রৌদ্রোজ্জ্বল দার্জ্জিলিং শহরের অধিবাসীদের অভিবাদন জানাইল।

পাখির বাসা

দার্জ্জিলিং শহরে রৌদ্রের উদয় একটা বিরাট ঘটনা। মেঘ ও কুয়াসার ঢাক্‌নার আড়াল হইতে দার্জ্জিলিং শহর এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রৌদ্র-মধুর প্রভাত রৌপ্যোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পুলকিত জনতার আনন্দ কমিল না। ম্যাল্‌-এ, অবজার্ভেটরি পাহাড়ের চূড়ায়, বার্চ হিল্‌ এবং জলাপাহাড়ের পথে নতুন সীজনের স্ফীত জনতা সর্ব্ব প্রথম সুযোগ লাভ করিয়া হিমালয়ের সকল মাধুর্য্য উপভোগের জন্য অধৈর্য্য অভিযান শুরু করিয়াছে। অতি সাধারণ দৃশ্য এবং অতি সাধারণ মানুষও অপূর্ব্ব মনে হইতেছে। যে অবাস্তবের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগিয়াছিল, আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সেই সকল সন্দেহেরই নিরসন হইল।

এই একটানা স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্যে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের এক কোণায় অনেকগুলি ছোট ছোট মানুষ কিন্তু আটকা পড়িয়া গিয়াছিল। এমন একটা চমৎকার দুপুরেও তাহাদের বাহির হইবার জো নাই। যথেচ্ছ ভ্রমণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অগত্যা তাহারা যথেচ্ছা-চারের দিকে মন দিয়াছে।

জলা-পাহাড়ের প্রায় হাজার ফুট নিচে, এবং অক্‌ল্যাণ্ড রোডের স্তরের কিছুটা উপরে ডাঃ সেনের প্রাইভেট স্কুলের বাড়ি 'অরুণাচল'। মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেল ছাড়াইয়া অক্‌ল্যাণ্ড রোড যেখানে কিছুটা বন্য হওয়া শুরু করিয়াছে, সেখান হইতে একটি নিজস্ব রাস্তায় সামান্য উঠিয়া 'অরুণাচলে'র বাগান ও সবুজ লন্‌-এ প্রবেশ করা যায়। লনের পূর্ব্ব প্রান্তে পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া কাঠ ও কাচে তৈরি ও বহু ত্রিকোণ

চূড়ায় মণ্ডিত বিলিতি স্থাপত্যভঙ্গির একটা দোতলা বাংলো। ইহার অদূরে, চৌহদ্দির দক্ষিণপ্রান্তে, টানা লম্বা একটানা স্কুলবাড়ি। কাচের দেওয়ালের ভিতর দিয়া মূল্যবান রঙিন পর্দার আভাস দেখা যায়। খদের দিক কাঁটাতারের উঁচু বেড়া দিয়া রক্ষিত। দার্জ্জিলিঙের অনেক বাড়ির মতো 'অরুণাচল'ও যেন অবশিষ্ট জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন একটা স্বতন্ত্র রাজ্য। পিছনে পাহাড়ের দেওয়াল, সমুখে শূন্য, তারও নিচে কার্ট রোড। লনের তিন দিক ঘেরিয়া শাদা পাথর-ছড়ানো রাস্তা; তার পাশে পাশে ফুলের বেড্‌গুলিতে নানা মশুমি ফুল ফুটিয়াছে। বাংলোর গাড়ি-বারান্দার থাম দুটির চতুর্দ্দিক এবং সিঁড়ির উভয় প্রান্ত ছোট ও বড় নানা রকম টবে ভর্ত্তি। সিঁড়ি দিয়া উঠিলেই প্রথমে হল-ঘর; এক ধারে লাইব্রেরি ও দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী খাওয়ার ঘর। উয়িং-এর বিভিন্ন কামরাগুলি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। উপর তলার ঘরগুলি সবই শোওয়ার ঘর। তা ছাড়া বাংলোর পিছনে ম্যাগ্‌নো-লিয়া গাছে ঢাকা বাবুর্চ্চিখানা ও চাকরদের ঘর: ওদিকে খদের ধারে কাচের দেওয়ালমণ্ডিত স্কুলবাড়িটি গোটা পাঁচেক ঘরে বিভক্ত। ইহাতেই শ্রেণীবিভাগ কুলাইয়া যায়। সব মিলিয়া 'অরুণাচল' জন ত্রিশ-চল্লিশ ছোট বড়ো অধিবাসীর পক্ষে যথেষ্ট।

রৌদ্রদীপ্ত রবিবারের এই দুপুরে 'অরুণাচলে'র বড়ো হল্‌-ঘরের একপ্রান্তে উত্তরমুখী প্রকাণ্ড জানালাটার কাছে কালো রেক্সিনে মোড়া আরাম-কেদারাটায় এলাইয়া আধুনিক ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে হালে প্রকাশিত একখানা বই অতি নিবিষ্টভাবে পাঠ করিতেছিলেন ডাঃ সেন। মহেন্দ্র সেনের বয়স সত্তরের উপর। শাদা চুল ও শাদা দাড়িতে শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে সখ্য সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। আজ

রৌদ্র উঠিতে দেখিয়া উত্তরে তাহার তুষারময় বন্ধুটির আবির্ভাবের আশায় অনেকবার তিনি পাহাড়ের উপর দিয়া সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু বুড়ো কাঞ্চনজঙ্ঘা সাহস করিয়া ঘরের বাহির হয় নাই। ডাঃ সেনও হন নাই। নাতিনী অসীমা বাহির হইয়াছে কেনা-কাটায়; স্কুলের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন ছেলেমেয়েকে দাদুর হেফাজতে রাখিয়া গিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের শাসাইয়া গিয়াছে, তাহার অনুপস্থিতিতে কেহ যেন হল-ঘরের বাহিরে না যায়। দাদুকে বারবার এদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়া গেছে। দাদু কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু অসীমার প্রস্থানের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দায়িত্বের সকল কথা বিস্মৃত হইয়া বইয়ের পাতায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

এতক্ষণ ধরিয়া শ্রীমতী ইনু দাদুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া মায়েরা শিশুর স্বল্প চুল দিয়া যেমন ছোট ছোট বেণী পাকাইয়া তোলে, তেমনি দাদুর সারা মাথায় বেণী পাকাইয়া তুলিয়াছে; বৃদ্ধ কিছুই টের পান নাই। এইবার ইনু বাগান হইতে ফ্রক-ভর্ত্তি ছোট রঙিন ফুল আনিয়া স্বরচিত এই বেণীগুলির অলঙ্করণে মনোযোগ দিল।

শুধু ইনুই নয়। আইন ও শৃঙ্খলার কর্ত্তৃপক্ষের এই অন্যমনস্কতার সুযোগে ঘরের অর্দ্ধেক ক্ষুদে বাসিন্দাই চুপে চুপে বাগানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে স্কুলের নেপালী চৌকিদার সদাহাস্যপরায়ণ মানবাহাদুরের হাস্যলেশহীন স্ত্রী সর্ব্বজনপরিচিতা 'নানী'র কণ্ঠতাড়নায় তাহারা কিছুটা আড়ষ্ট হইয়া আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু নানীকে তাহারা ভারিই তোয়াক্কা করে যে, তাহার চেঁচামেচিতে ভয় পাইবে! দরকার হইলে তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিবে। নানী আগে

তাহার ছেলে জংবাহাদুর ও তাহার স্বামী মানবাহাদুরের বড়ো বড়ো কুকুরি দুটোর কথা উল্লেখ করিয়া দুরন্তদের ভয় দেখাইত ; এখন তাহাতে কোনও ফল হয় না ; শাসন-অমান্যকারীরা এত দিনের অভিজ্ঞতায় বেশ টের পাইয়াছে যে, নানী তাহার স্বামী বা পুত্রকে কুকুরি লইয়া আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করা দূরে থাকুক, দিদির কাছে কাহারো নাম করিয়া নালিশ পর্য্যন্ত করে না ; তাহার শাসানি একেবারেই অন্তঃসারশূন্য ।

যাহারা হল-ঘরের গণ্ডি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় নাই, তাহারাও কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ভদ্র-আচরণ সম্বন্ধে সকল শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া শিবু এবং তাতা ঘরের একপ্রান্তের নতুন বড়ো কৌচটার পিঠ-রাখিবার গদির দেওয়ালে চড়িয়া বসিয়া উপবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গাটায় ক্রমাগত লাথি মারিয়া মোটর সাইকেলে প্যাডেল করিতেছে, এবং মুখ দিয়া অনর্গল ভট্-ভট্-ভট্ শব্দ বাহির করিয়া মোটর সাইকেলের উৎকট ধ্বনি এবং গতি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে ।

ঘরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশে ময়না তার পুতুলের সংসার সাজাইয়া বসিয়াছে, যেন নিভৃতে, কল-কোলাহল হইতে দূরে, সে তাহার নীড়ের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। তবে সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে যে উদাসীন নয়, তাহা শীঘ্রই টের পাওয়া গেল। ডান হাতের মুঠোটা কানে চাপিয়া কনুয়ের কাছে মুখ রাখিয়া সে কহিল ঃ ফাইভ্ সিকস্ টু—হ্যালো, কে ? কে আপনি ? ইন্দিরাদি ? সুমন্ত এসেছে কি, ইন্দিরাদি ? কলকাতা থেকে এখনও আসেনি ? পূজোর ছুটি কবে ?' এই ধরণের চোঙে কথা বলিলে কোনও টেলিফোন-কোম্পানীই সে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কিন্তু তা হইলে কি হয়,

দেখা গেল হাত দশেক দূরে উপবিষ্ট টুটু তাহা নিজের মুঠো-রিসি-ভারের মারফৎ অবিকল শুনিতে পাইয়াছে। সেও নিজের কনুইয়ের উপর কহিলঃ 'হ্যাঁ ভাই, আমিই ইন্দিরাদি। না ভাই, সুমন্ত এখনও আসেনি। ছেলের জন্য বড়ো ভাবনায় আছি।…শিউলি কি ইস্কুলে গেছে? বড় লক্ষ্মী, ভাই, তোমার মেয়েটি। সুমন্তের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলে কেমন হয় ভাই?'

ফায়ার-প্লেসের ধারে বছর আটেকের রোগা চশমা-পরা মেয়ে ডলী ভূত-প্রেতের ছবিঅলা একটা বই নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল; ঝগড়া-বাজ কানু ইতিমধ্যে বহুবার তার বই টানিয়া, চুল আকর্ষণ করিয়া, ক্যাম্বিসের টুলটা দোলাইয়া বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ডলীর মনোযোগ ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক প্রকাণ্ড নাকঅলা ভূত তাহাকে আবিষ্ট করিয়াছে; ইহার এই ভয়ঙ্কর লম্বা এবং ছুঁচলো নাকটা রাজা ও রাণীকে চম্‌কাইয়া দিয়া, কোটালকে পলায়নে বাধ্য করিয়া এইবার কোথায় আত্মপ্রকাশ করে, ডলী কণ্টকিত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, সহসা সে নিজেই 'ওরে বাবারে!' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে নাকালো ভূতের ভয়ঙ্কর নাকট ফায়ার-প্লেসের ধোঁয়া বাহির হইবার চোঙ্ দিয়া গলাইয়া তাহার পায়ের কড়ে আঙুল কামড়াইয়া ধরিয়াছে! তড়িৎস্পৃষ্টের মত ডলী লাফাইয়া দাঁড়াইল।

'দাঁড়াও, দিদি ফিরে আসুক, তোমার নামে নালিশ না করি তো কি বলছি।'

'যা যা কাপুরুষ!' কানু ব্যাকরণকে সম্মান না করিয়া ডলীর ভীতি-প্রদর্শনের জবাব দিল। 'লজ্জা করে না? আঙুলে সুড়সুড়ি

দিতেই পাঁচ হাত লাফিয়ে উঠলি, আবার-ভূত পেত্নীর গল্প পড়িস ? করিস নালিশ ; আমিও বলব আমার হাত কামড়ে দিয়েছিলি !'

'দিইচি !' ডলী সপ্রতিবাদে কহিল, 'দাগ কোথায় ?'

'আমি নিজেই কামড়ে দাগ করে নেব,' কানু না দমিয়া কহিল।

'ইস্কুলে পড়ে এই শিখচ !' ডলী রীতিমত মাস্টারি-ভঙ্গিতে কহিল, 'বেশ, ভগবান আছেন। ভগবান সব দেখেন। আজ প্রার্থনার সময় আমি তোমার নামে নালিশ করব, দেখো !'

কানু ইহার কোনও বাচনিক জবাব দিল না, শুধু ডলীর মাথায় একটা সশব্দ টোকা দিয়া, 'ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়' ধরণের একটা ভঙ্গি করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

প্রবলের অত্যাচার দুর্ব্বলকে সর্ব্বদাই সহিতে হয়। ডলী বেচারি রোগা মানুষ, মারামারিতে সে একান্তই অপটু ; শুধু বাঙালি ভদ্র-লোকদের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই সে সভায় প্রতিবাদ জানাইয়া থাকে। ইহাতে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। এই তৃপ্তিটুকুও মাথায় এক টোকা মারিয়া কানু ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

'হ্যাণ্ডস্ আপ্ !'

সহসা আদেশের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া ডলী তাড়াতাড়ি পিছনে চাহিল। দেখিল, দরজাটার মুখে কাঠের পিস্তল উঁচু করিয়া ধরিয়া আক্রমণকারী সেনাপতির দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে বাদল। তার পিছনে অনুরূপ নানারকম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আরও আধডজন

যোদ্ধা। সেনাপতির পার্শ্বচর হিসাবে বীরাঙ্গনা বুলু যুযুৎসু ভঙ্গিতে পরবর্ত্তী আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।

অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া ভিতরের অধিবাসীরা কোলাহল করিয়া উঠিল। মোটর সাইকেল চালনা-রত শিবু ও তাতা, ঝগড়াটে কানু এবং আরও দুয়েকজন পুরুষীয় রীতি অনুসরণ করিয়া বাধা দানের জন্য আগাইয়া আসিবে কিনা ভাবিতে লাগিল। বিনা যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করা কি উচিত? কিন্তু যেই না কানু বুক ফুলাইয়া 'বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' ভঙ্গিতে দেড় পা আগাইয়া আসিয়া মাত্র 'খবরদার' বলিয়াছে, অমনি অভিযানকারী বাহিনীর সেনাপতি বাদল হুকুম দিল: 'অ্যাটাক্।'

পলকে বাদলের দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; কাঠের পিস্তল হইতে অদৃশ্য গুলি অবিচ্ছিন্নভাবে ছুটিতে লাগিল; পিস্তলধারীদের মুখ হইতে অনবরত গুলির শব্দ হইতে লাগিল, গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হয় না, পিস্তলের গুলির চেয়ে ইহারা গায়ের জোরের উপরেই বেশি ভরসা করে। এ যেন বেয়োনেট-চার্জের সময় বেয়োনেট ফেলিয়া গুর্খা সৈন্যের কুক্‌রি লইয়া আক্রমণ! কিন্তু কাঠের গুলি খাইয়া কোন্ শত্রু আর কাবু হইত! যাহা হউক, মল্লযুদ্ধে আত্মরক্ষাকারীরা সহজেই পরাজিত হইল। শিবু, তাতা প্রভৃতি বন্দী হইল। বেশী হাত-পা ছোঁড়ার অপরাধে কানুকে স্কীপিং রোপ্ দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল।

'খুলে দাও, খুলে দাও বলচি, বাদল', কানু বাঁধন ছিঁড়িবার আপ্রাণ চেষ্টায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, 'শীগগির খুলে দাও। দস্যু কোথাকার!

আমার চামড়া কেটে গেছে। আমি কিন্তু ঠিক দিদিকে বলে দেব।'

বাদলের রাজ্যে নারীদের অসম্মান করা হয় না, যদি না তারা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। ডলী মুক্তই ছিল। সে কানুর দুর্দ্দশায় অতিশয় তৃপ্ত বোধ করিয়া বাদলের হইয়া কহিল, 'কাপুরুষ, লজ্জা করে না? যুদ্ধে হেরে আবার কান্না শুরু করেচ।'

'চুপ্ র', মুখপুড়ী,' কানু ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল, 'একবার ছাড়া পাই না, তোকে মজাটা দেখাব।'

'মেয়েদের গায়ে হাত তুলবি!' বিজয়ী সেনাপতি বাদল কহিল। 'কাপুরুষ কোথাকার! মেয়েদের ভয় দেখাতে লজ্জা করে না!—নরাধম, এর শাস্তি ভোগ কর্। কর্ণেল নন্তু, অত্যাচারী কানুকে কারাগারে নিক্ষেপ করো', বলিয়া বাদল তাহার চীফ্ অব্ স্টাফ নন্তুকে অগ্নিহীন ফায়ার-প্লেসের অভ্যন্তরটা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

এই চেঁচামেচির কিছুটা ডাঃ সেনের অভিনিবেশের রাজ্যে পর্য্যন্ত অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকিবে; বই হইতে চোখ উঠাইয়া একবার তিনি এদিক ওদিক চাহিলেন। সাধারণ সাবধান-বাণী হিসাবে কহিলেন, 'ওরে, এত চেঁচামেচি করিসনে। আর একটু চুপ-চাপ হয়ে খেলা কর, বাবারা। দিদিমণি এসে চেঁচামেচি শুনলে রাগ করবে এখন। তোরা তো বকুনি খাবিই, এই বুড়ো বয়সে আমিও রেহাই পাব না। বাইরে কেউ যাসনি তো?'।

'না দাদু, আমরা সব ঘরেই আছি,' বাদল ভরসা দিয়া কহিল। 'আমরা আই, এন্, এ—আই, এন, এ খেলচি।'

নিশ্চিত হইয়া ডাঃ সেন আবার বইয়েতে মনোযোগ দিলেন। এত বড় একটা রাষ্ট্রবিপ্লব যে তাঁর দশ হাতের মধ্যে সংঘটিত হইল, সে সম্বন্ধে কোনও খবরই তিনি জানিতে পারিলেন না। এমন কি, চ্যাং-দোলায় চড়িয়া কানু যে শেষ-চেষ্টা হিসাবে 'দাদু' 'দাদু' বলিয়া আর্ত্ত আবেদন জানাইতে লাগিল, তাহাও জনতার হাততালির দরুণ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

বেচারি কানুর অন্ধকূপ হইতে রক্ষা পাওয়ার আর কোনও উপায়ই রহিল না। দেখা গেল, তার স্বপক্ষীয়েরাও বিজেতাদের অনুগ্রহ কামনায় তাহার বিপক্ষে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজ্য-শুদ্ধ যাহারই কানুর বিরুদ্ধে লজেঞ্চুষ কাড়িয়া নেওয়া হইতে মাথায় চাঁটি দেওয়া পর্য্যন্ত যে কোনও রকম ছোট বড়ো অভিযোগ ছিল, এইবার সময় বুঝিয়া তাহারা সকলেই তাহার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইল। ফাযার-প্লেসের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কানু ভূত হইয়া উঠিলে ইহারা আন্তরিক খুসি হইবে।

বাদল হুকুম দিল, 'থ্রো।'

কিন্তু আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। সহসা জানালার কাছ হইতে বাদলের সৈন্যবাহিনীর ইণ্টেলিজেন্স্ অফিসার গণু চেঁচাইয়া উঠিল : 'বাদল, দিদি! দিদি!'

ব্যস, এক সেকেণ্ডে সকল আয়োজন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। দর্শকেরা ছুটোছুটি করিয়া নিজ নিজ আসন অধিকার করিল। অতি ভদ্র, শান্ত ও শিষ্ট ছাড়া কেহ ইহাদের অন্য কিছু বলুক দেখি! শিবু ও তাতা কৌচটাকে আর মোটর সাইকেল হিসাবে গণ্য না করিয়া বসিবার আসন হিসাবেই গণ্য করিল, এবং তাহাতে যথারীতি উপবেশনপূর্ব্বক কাগজের নৌকা ও পাখি তৈয়ারির দিকে মন দিল। ময়না ও টুটু

নীরবে তাহাদের ঘরকন্না করিতে লাগিল ; ডলী ফায়ার-প্লেসের কাছ হইতে দাদুর সন্নিকটের নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়া আসিয়া ভূতপেত্নীর অনুসরণ শুরু করিল ; আক্রমণকারী ও আক্রান্তেরা যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বিস্মৃত হইয়া শান্তিকালীন কর্ত্তব্যসমূহের প্রতি অবহিত হইল। সেনাপতি বাদল ও তাহার চীফ অব স্টাফ্ নন্তু চটপট্ বন্দী কানুর বাঁধন খুলিতে আরম্ভ করিল।

পরক্ষণেই বাহিরে অসীমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ বাবালোগকো দুধ দিয়া, নানী ? হ্যাঁ, কেলা, শুন্তালা (কমলালেবু) আউর কেক্ টেবিলমে য়ায় গা।'

দুই

অসীমার বয়স সাতাশের উর্দ্ধে, কিন্তু এখনও সে অবিবাহিত। রূপসী না হইলেও সে কুশ্রী নয়। তার গায়ের রং উজ্জ্বল; চওড়া কপালে, উঁচু নাকে, ঠোঁটের দৃঢ়তায় ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। চোখের দৃষ্টি গভীর, কিন্তু প্রসন্ন। অসীমা সেই ধরণের মেয়ে যাকে ভালো লাগিতে আটকায় না, কিন্তু অন্তরঙ্গতা করিতে ভয় হয়। কিন্তু এই মর্য্যাদা তার সহজাত। অবস্থাক্রমে শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইলেও চেষ্টা করিয়া একটা কাঠিন্যের মুখোস তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই।

অসীমার বয়স যখন মাত্র বছর সাত কি আট, তখন এক দিন ভাগ্যদেবতা তাহাদের গৃহে এক মহাতাণ্ডব বাধাইয়া দিলেন। প্রথমেই তার তরুণী মা, তারপর তার বাবা, এবং অবশেষে তার ঠাকুরমা মহামারীর এক উন্মত্ত প্রবাহে ভাসিয়া দৃষ্টির এবং বুদ্ধির বাহিরে চলিয়া গেল। প্লাবনের অবসান হইলে দেখা গেল, সংসারের ডাঙায় পড়িয়া রহিয়াছে শুধু এক মধ্যবয়স্ক দাদু ও তাহার শিশু নাতিনী।

ডাঃ সেনের পেন্সন হইতে তখনও বছর চারেক দেরি ছিল। কিন্তু অত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার আর ধৈর্য্য ছিল না। ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিস হইতে আগাম অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জনতার

ভিড় হইতে পাহাড়ের আংশিক নির্জ্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে পালাইয়া আসিলেন।

'অরুণাচল' কেনা হইল। কিন্তু আট বছরের নাতিনী একা একা থাকে কি করিয়া? সঙ্গী না পাইলে তার চলিবে কেন? ডাঃ সেনের বাড়িতে দু-চারটি করিয়া শিশুর আমদানি হইল; বিপন্ন আত্মীয় বা বন্ধুরা নিজেদের বা আত্মীয়দের যে সব শিশুকে লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের আবির্ভাব হইতে লাগিল ডাঃ সেনের অতিথি-বৎসল গৃহে। ডাঃ সেনের ইস্কুলের সূত্রপাত হইল।

ইহার পর ষোল-সতেরো বছর কাটিয়া গিয়াছে; পুরানো ছেলেরা চলিয়া গিয়াছে, নতুন ছেলেমেয়ের আমদানি হইয়াছে; শিশু অসীমা এম্-এ পাস করিয়াছে; ডাঃ সেনের এই অদ্ভুত ইস্কুলের ভার নিজের হাতে লইয়াছে। চারিদিকে নাম রটিযাছে ইহার; বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট লোক এখানে ছেলে রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু ইহার মৌলিক কাঠামো এখনও বদলায় নাই। এখনও ডাঃ সেনের 'চিল্-ড্রেন্স্ হোম্' পুরাপুরিই অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান।

এজন্যই এখানে বেশি ছেলেমেয়ে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া, যাহারা ইহার আদর্শ ও ইহার শিক্ষণ-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হইয়া নিজেদের ছেলেমেয়েদের এখানে রাখিতে উৎসুক, তাহারাও ডাঃ সেনকে খরচ লইতে রাজি করিতে না পারায় ছেলে পাঠাইতে পারে না। পীড়াপীড়ি করিলে ডাঃ সেন সর্ব্বদা সহাস্যে বলেন: 'এ তো আমার খেলাঘর! এখানে টাকা-পয়সার প্রশ্ন ওঠালে সব মজা মাটি হয়ে যাবে। খেলা আর জমবে না।'

অথচ টাকা-পয়সার অভাবেই যে তাঁহার এই 'খেলাঘর'টি মাটি

হইয়া যাইবে না, এমনও আর জোর করিয়া বলা যায় না। এক সময় ছিল যখন ডাঃ সেনের প্রোপোর্শানেট পেন্সনের টাকাটাতেই খরচ কুলাইয়া যাইত; তার উপর কালক্রমে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড, জিমখানা-ক্লাব, এমন কি কলিকাতার আই, এফ্ এ-র কাছ হইতে পর্য্যন্ত বাৎসরিক অথবা আকস্মিক দান পাওয়া গিয়াছে। ইস্কুলের অনেক মোটা খরচ ইহাতে কুলাইয়া গেছে। কিন্তু সময় বদ্‌লাইয়া গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পরও কিছুকাল টের পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে আর সন্দেহ রহিল না। দ্রব্যমূল্য হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল; জীবন-যাত্রার খরচ আগের তিনগুণ হইল। ডাঃ সেনের পেন্সনে আর খরচ কুলায় না। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাৎসরিক সাহায্য অক্ষুন্ন রহিল বটে, কিন্তু অন্যান্য বহু আকস্মিক সাহায্য ইংরেজ-তোষণের জন্য দিক-পরিবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধ-তহবিল-গুলির দিকে যাত্রা করিল! ডাঃ সেনের সঞ্চয়ের উপর হাত পড়িল। কিন্তু বাজেট মিলাইবার এ রীতি যে দীর্ঘায়ু হইতে পারে না, তাহাতে ডাঃ সেন বা নাতিনী অসীমার সন্দেহমাত্র নাই। এইবার হয় বাসিন্দা-দের সংখ্যা কমাইতে হইবে, নয়তো অন্য পাঁচটা পেশাদারি বোর্ডিং স্কুলের মতো দক্ষিণা লইয়া ছাত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃদ্ধ ডাক্তার সেন এই দুই পন্থার কোনটিতেই যেন রাজি হইতে পারিতেছেন না। শিশুগুলি সব তার নিজের নাতি-নাতিনীর মতো। কোন্ প্রাণে তিনি ইহাদের চলিয়া যাইতে বলিবেন? পয়সা লইয়া নতুন ছাত্রছাত্রী নেওয়া চলে বটে, কিন্তু তাহাতে যে ইস্কুলের প্রকৃতিই বদ্‌লাইয়া যাইবে। পয়সা লইবার পর তিনি আর 'দাদু' থাকিবেন না, 'প্রিন্সিপ্যাল' হইয়া উঠিবেন।

অসীমা তর্ক করে। বলে, এতে কোনও দোষ নেই, দাদু। বাপ-মায়েরা তো ছেলেদের পড়াতে পয়সা ব্যয় করবেই। তাদের পয়সার বিনিময়ে আমরা যদি তাদের ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দিতে পারি, তবেই যথেষ্ট। এদের সকলের খরচ আমরা নিজেরা চালাবো, আমাদের এমন সামর্থ্য কোথায়? স্টেট্ থেকে যদি সাহায্য পাওয়া যায়, এক তবেই এমন ব্যবস্থা সম্ভব।'

'তা যে রকম নাম হয়েচে তোর ইস্কুলের, সরকার থেকেই একদিন মোটা টাকা মঞ্জুর হয়ে যাবে দেখিস!' দাদু রগড় করিয়া বলেন।

'হুঁ, তাই না আরও কিছু।' অসীমা ঠোঁট বাঁকাইয়া নাক কুঁচ-কাইয়া জবাব দেয়। 'তাদের বয়ে গেছে!'

ডাঃ সেন মুখ তুলিয়া মৃদু হাসেন। বলেন, 'তবে অন্য কেউ দেবে। দেশে বড়লোকের তো অভাব নেই, দিদিমণি। আমরা যদি ভালো কাজ করে থাকি, কেউ একদিন তার কদর করবেই।'

অসীমা হল-ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে অখণ্ড শান্তি ও বিস্ময়কর শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। সে হাসিয়া কহিল, 'বাঃ, এ যে চমৎকার লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে দেখচি।...চলো, এইবার সব দুধ খাবে। আর ভালো হয়ে থাকার পুরস্কার প্লাম কেক্!...'

'না দিদি, বাদল বাইরে গিয়েছিল,' কানু চেঁচাইয়া অভিযোগ করিল। 'এইমাত্র ভেতরে এসে, মারামারি শুরু করেচে...'

'কানু আমার পায়ে চিমটি কেটেচে, আর মাথায় শুধু শুধু চাঁটি মেরেচে, দিদি!' ডলী চশমা-আঁটা চোখ তুলিয়া নালিশ জানাইল।

'আমার পেটেও কানু ঘুষি মেরেছিল,' মোটর সাইকেলের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব আরোহী তাতা কহিল।

'হ্যাঁ, মেরেছিলাম!' কানু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল। 'তুমি যে সোফার উপর চড়ে' সাইকেল চালাচ্ছিলে, তা বলে দেব? আমি ঘুষি মেরেচি না নাবিয়ে দিতে গেছি!'

'আর তুমি নিজেই যে ম্যান্‌টেল্‌পিসের উপর চড়ে বসেছিলে, তার কি!' নন্তু প্রশ্ন করিল।

'আর নিজেরা যে আমাকে বেঁধে ফেল্লে! আমার হাতের চামড়া কেটে গেচে। বাদল আর তুমি। আর আমাকে চুলোর মধ্যে ঢুকোচ্ছিলে। তুমি এসে পড়লে বলেই তো পালিয়ে গেল, দিদি, নইলে আমাকে ওরা মেরে ফেলত...'

'তুমি যে মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে গেলে, তার কি?' ঝাঁসির রাণী বাহিনীর বুলু কহিল।

দেখিতে দেখিতে অসীমার চারিদিকে অভিযোগকারী ও অভিযোগকারিণীর ভিড় দাঁড়াইয়া গেল। পরস্পরবিরোধী এই সকল অভিযোগের ফয়সালা করিতে যে কোনও নিপুণ বিচারকই হিমসিম খাইয়া যাইত। কিন্তু অসীমা এক কথায় ইহাদের বিচার সমাপ্ত করিয়া মোক্ষম রায় প্রকাশ করিল। 'ওঃ, এত সব ব্যাপার ঘটেচে!' অসীমা গম্ভীর ভাবেই কহিল। 'এর শাস্তি, রবিবারের ছুটি বন্ধ। পড়া না থাকলেই যদি ঝগড়া শুরু করবে, তবে সপ্তাহের একদিনও পড়া ছাড়া থাকবে না।...এসো, দুধ খেতে এসো। কেক্ এনেছিলাম, কেক্ তোলা থাকবে।...'

ময়না কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিল, 'আমি তো কোনও দুষ্টুমি করিনি, দিদি। আমি তো চুপ করে' খেলছিলাম...'

টুটুও নিজেকে নিরপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিল। কহিল, 'আমিও চুপটি করে খেলা করছিলাম, দিদি। একটুও গোল করিনি; শুধু আস্তে আস্তে পুতুলের টেলিফোনে কথা বলেচি। আমাদের কেক্ দেবে না কেন?'

'আমিও দুষ্টুমি করিনি, দিদি।' ইনু কেক্-প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করিবার উদ্দেশ্যে কহিল। 'একবারও আমি বাইরে যাইনি।'

'যাস্‌নি!' শিবু ধমকাইয়া কহিল। 'দাদুর চুলে বেণী করে' তবে কে ফুল এনে গুঁজে দিয়েচে? মিথ্যেবাদী কোথাকার। ঐগুলো কি?' বলিয়া সে ঘরের অপর প্রান্তে ডাঃ সেনের মর্শুমি ফুল গোঁজা পক্ব কেশভরা মাথার দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিল।

অসীমা আড় চোখে তাকাইয়া দেখিল। এক ঝলক হাসি ঠোঁট ও গালের উপর জোয়ারের জলের মতো সহসা ছুটিয়া আসিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া তাহার চিহ্ন লোপ করিতে হইল। ডাঃ সেনের শাদা মাথার উপর স্থানে স্থানে যেন সোনা লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় রৌদ্রের ছোঁয়া লাগিয়াছে।

নিঃশব্দে অসীমা আগাইয়া গেল। যেন একটা গুরুতর অপরাধের সন্ধান পাইয়া দারোগাবাবু তাহার তদন্তে চলিয়াছেন। অপরাধী ছেলে-মেয়ের দল নির্ব্বাকভাবে পিছনে পিছনে চলিল। এটা যেন আর ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ নয়, সমগ্রভাবে প্রত্যেকেই ইহার জন্য দায়ি।

'দাদু?'

'এসে পড়েছিস্, দিদিমণি? দেখ, কেমন শান্ত হয়ে আছে তোর ছাত্রছাত্রীরা…'

'হুঁ, তা বৈ কি। তুমি কিচ্ছু দেখ না। তোমাকে পাহারায় রেখে

যাওয়া আর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পাহারায় রেখে যাওয়া, একই কথা। এর মধ্যে কতসব দস্যিপনা হয়ে গেল, তুমি কি তার কোনওটারই খবর রাখো!...'

'তা আর রাখি না', ডাঃ সেন হাতের বই পাশের ছোট টেবিলটায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কহিলেন, 'আই, এন, এ, আই, এন, এ খেলা হয়ে গেল। আমাদের নিজেদের প্রথম সৈন্যদল, তার আর খোঁজ রাখব না।...আর সৈন্যদল হাজির হলে কিছু গোলমাল ঘটবেই।...'

কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ, চীফ-অব-স্টাফ, ঝাঁসির রাণী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্যতম সৈন্যের চোখে পর্য্যন্ত চমক খেলিয়া গেল। সভয়ে আড় চোখে তাহারা দিদির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল।

'আর নিজের মাথাতেই যে এসব রঙিন নিশান বসিয়ে দিয়ে গেচে, তার খোঁজ রাখো কি?' বলিয়া অসীমা একটা বহুবর্ণ জিনিয়া ফুল দাদুর পাকা মাথার বেণীর শিকলি হইতে খুলিয়া আনিয়া দেখাইল।

ডাঃ সেন উদ্ভাসিত মুখে কহিলেন, 'এ ওরা নয়, দিদিমণি। সৈন্যেরা কি আর মাথার সুড়সুড়ি দেয়, তারা মাথা কেটে ফেলে। এটা হলো ঐ মেয়েটির কাজ!' বলিয়া মুখ দুষ্টামিতে ভরিয়া তুলিয়া তিনি ইনুর দিকে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দেখাইলেন। 'পাকা চুল টেনে তুললে আমি আপত্তি করতাম; সারা মাথাই ফর্শা হয়ে যেত যে। কিন্তু চুলের যত্ন করচে দেখে আর কথাটি বলিনি', বলিয়া বৃদ্ধ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

অসীমা শিশুদের দিকে চাহিয়া দেখিতে আর সাহস করিল না। দৃষ্টিটা খানা-কামরার দিকে নিক্ষেপ করিয়া যথাসাধ্য গম্ভীরভাবেই কহিল, 'যাও, সব খাবার ঘরে গিয়ে নিজের নিজের চেয়ারে বসো।...চল, দাদু। চায়ের জল দিতে বলেচি।...'

টুটু লোভীর মতো কহিল, 'আর কেক্, দিদি ?···'

অসীমার এবার আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা সম্ভবপর হইল না। উদ্গত হাস্যকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিয়া সে কহিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, কেক্ও পাবে। এইবার সব যাও···'

নিমেষে অপরাধী এবং নিরপরাধ সকলেরই মাথার উপর হইতে বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল। খুসির রৌদ্র উঠিল। হাসি ও গুঞ্জন করিতে করিতে ডাঃ সেনের ইস্কুলের ত্রিশটি বালক-বালিকা খানা-কামরায় নিজ নিজ আসন অধিকার করিবার জন্য দরজার দিকে ভিড় করিল।

তিন

লাইব্রেরির ঘড়িটাতে দশটা বাজিবার শব্দ শুনিয়া অসীমা হিসাবের খাতা হইতে চোখ উঠাইল ; ছাতার মতো মেলা বিজলী আলোর ডোম্‌টার নিচে ইজিচেয়ারে পাঠ-নিরত দাদুর দিকে চাহিল। সত্তরের উপর বয়স হইয়াছে ; চশমার পুরু কাচের সহায়তা সত্ত্বেও দৃষ্টি-শক্তি পর্য্যাপ্ত নয় ; কিন্তু অধ্যয়নের আগ্রহ এখনও আগের মতোই প্রবল। খাওয়া-শোওয়ার সময় সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে হয়।

'বাঃ দাদু,' অসীমা রাইটিং-টেবিলের উপর দিয়া দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া যেন ছোট ছেলেকে শাসন করিতেছে এমনই ভঙ্গিতে কহিল, 'তোমাকে কখন শুতে যেতে বল্লুম! এখনও বসে বসে বই পড়চ! শোবার আগে এত বই পড়লে রাতে তোমার ঘুম আসে না, তা ভুলে গেছ?'

'শুতে যেতে বলেছিলি বুঝি, দিদিমণি!' ডাঃ সেন বই বুজাইয়া কহিলেন। 'তবে তো বড় অপরাধ করে ফেলেছি! আমি বরঞ্চ ভাবলাম, আমি তোর বাচ্চাদের দলের মধ্যে পড়ি না। ভুল করেছিলাম। তা বেশ, এবার শোওয়া যাক গিয়ে।...আমি কি আর শুধু শুধু বসে আছি, তোকে পাহারা দিচ্ছি...'

'থাক্, তোমাকে আর পাহারা দিতে হবে না,' অসীমা টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া খাতা বন্ধ করিয়া কহিল। 'এটা আজকের

জন্য বন্ধ থাকুক। যতই দেখচি, মন খারাপ হয়ে যাচ্চে। এরই মধ্যে ২৮০৲ টাকা বাজেটের ওপরে গিয়েচে, মাসের এখনও ন' দশ দিন বাকি। হিসেবের খাতা খুললেই জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে…'

'ঐ জন্যেই তো তোকে বলি, দিদিমণি,' ডাঃ সেন সকৌতুকে কহিলেন, 'হিসেব রেখে কাজ নেই, হিসেব বড়ো অসভ্য জিনিষ। ভদ্রলোকের সম্মান করতে জানে না…'

'না, দেখ দাদু,' অসীমা গম্ভীর হইয়া কহিল, 'উটপাখীর মতো চোখ বুজে সমস্যার সমাধান করা আর চলবে না। এটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার অবস্থায় আর নেই। তুমি ভাবচ, রগড় করে' আমার দুর্ভাবনা দূর করবে। তা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে আয়ের চেয়ে যদি তিন-চারশো টাকা করে' বেশি খরচ হয়, তবে এসব আর কতদিন চলবে? তোমার ব্যাঙ্কের হিসেব তো আমি জানি; তার উপর ক'দিন টান সইবে?'

ডাঃ সেন ক্ষণকাল শঙ্কিত দৃষ্টিতে নাতিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন শিশু বোধে ইহাকে ছলনা করিতে গিয়া সহসা হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। তারপর আবার তাহার মুখমণ্ডল কৌতুকানন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

'দেখ দিদিমণি, সেই যে আগের সীজনে কোথাকার এক রাজা তোর ইস্কুল দেখে খুব সুখ্যাতি করে গিয়েছিলেন, কি জানি নামটা, তাকে আমাদের জরুরি অবস্থা জানিয়ে একটা তার করলে কেমন হয়?'

'তুমি কেবলই ঠাট্টা করবে, দাদু,' অসীমা করুণ কিন্তু স্নিগ্ধ কণ্ঠে

কহিল। 'অথচ ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে উঠবার উপক্রম হয়েচে।…তার চেয়ে, এসো দাদু, কিছু বাইরের ছাত্রছাত্রী আমরা নেই ; আর বাড়ির ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের যারা খরচ দিতে প্রস্তুত আছেন, তাদের কাছ থেকেও টাকা নিতে রাজি হয়ে যাই। মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা আয় আমরা অনায়াসেই বাড়াতে পারি। এ ছাড়া আর উপায় নেই। তোমার এত সাধের, এত পরিশ্রমের ইস্কুলকে বাঁচাতে হলে…'

'তাতেই কি বাঁচবে, দিদিমণি?' সহসা বৃদ্ধ বাধা দিয়া কহিলেন।

'কেন বাঁচবে না? আমাদের আয় পাঁচশো টাকা বাড়লেই কুলিয়ে যাবে, দাদু। মিসেস্ থাপ্পা ছাডা আরও দু'একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী রাখতে হবে বটে, ডেস্ক্ টুলও বাড়াতে হবে, কিন্তু আর তো খরচ নেই। তুমি রাজি হয়ে যাও, লক্ষ্মীটি, দাদু। এই ইস্কুল ভেঙে গেলে আমাদের সবারই বুক ভেঙে যাবে। পড়িয়ে গুরু-দক্ষিণা নিতে দোষ কি? তুমি যখন কলেজে পড়াতে তোমার ছাত্রেরা কি মাইনে না দিয়েই পড়ত? ছেলেমেয়েদের যারা পড়ার খরচ দিতে পারে না, তাদের কাছে আমরা কখনই কিছু দাবি করবনা ; কিন্তু যারা পারে, যারা দিতে চায়, দিতে না পেরে যারা তোমার কাছ থেকে শিক্ষা-পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের কাছ থেকে তুমি আমাকে শিক্ষার খরচ নিতে দাও। তবেই সব ঘাট্‌তি পূরণ হয়ে যাবে…'

ডাঃ সেন নাতিনীর দিকে চোখ না তুলিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন, 'আর একটা মস্ত বড়ো ঘাট্‌তির কারণ যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসচে,

দিদিমণি। সে ঘাট্‌তি বড়ো ঘাট্‌তি; সারা ইস্কুলের অস্তিত্ব ধরেই তা টান দেবে, যদি না শক্তিমান অর্থবান কেউ স্বেচ্ছায় এর ভার নিতে এগিয়ে আসে। তার জন্য প্রস্তুত হবার কি করচ?...'

'কি বলচ, তুমি দাদু?' অসীমা কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে চোখ উঠাইল। 'আর ঘাট্‌তি কোথায়? আর ঘাট্‌তি হতে আমি দেব কেন?...'

ডাঃ সেন প্রশ্রয়ের হাসি হাসিলেন। প্রায় রগড়ের সুরেই কহিলেন:

'যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লী-পথের ধূলি 'পরে।'

দিদি, চার কুড়ির দিকে পা বাড়িয়েচি। আমার উপর ভরসা করে' আর কতদিন তুই ইস্কুল চালাবি? তাইতো এত দিনের ব্যবস্থার আর কোনও ওলট-পালট করতে চাইনে। যেমন চলচে চলুক; তারপর আমিও থাকব না, আমার খেলাঘরও আর থাকবে না।...'

দাদুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, ভালো করিয়া লেপ গুঁজিয়া, গরম জলের ব্যাগ্‌ পায়ের কাছে সুবিন্যস্ত করিয়া, আলো নিবাইয়া অসীমা বারান্দায় আসিল। বাঁ দিকে ছেলেদের ডর্মিটরি। অস্পষ্ট খাটগুলির দিকে একবার অলস দৃষ্টিপাত করিয়া অসীমা কাচের বন্ধ জানালাগুলির কাছে আসিয়া ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। দোতলার এই বারান্দা হইতে 'অরুণাচলে'র প্রত্যেকটা অংশই নজরে পড়ে।

ফুলের পাড় দেওয়া মসৃণ লন্‌টা একটা দামি নরম গালিচার মতো বাড়ির সামনে মেলা; ঘুমন্ত স্কুলবাড়ির পিছনে একসারি দীর্ঘকায় পাইন-গাছ যেন নিঃশব্দ সতর্ক সান্ত্রীর মতো শিশুপূর্ণ এই বাড়িটার পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আশ্চর্য্য পরিষ্কার রাত্রি। নিচের অক্‌ল্যাণ্ড রোড্ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এবং তাহারও নিম্ন স্তরে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের লাইন বুকে ধারণ করিয়া কার্টরোড চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। তারপর অরণ্যপূর্ণ গভীর খদ; অন্ধকার ও কুয়াসাপূর্ণ শূন্যতা এবং ইহার সুদূর পরপারে আবছা পাহাড়ের অন্তহীন তরঙ্গরেখা। কত পরিচিত এই দৃশ্য; সমস্ত জীবনটাই যেন এই নিরন্ধ্র পাহাড় এবং অরণ্য দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার বাহিরের জগৎটাকে একটা ভিন্নধর্মী আলাদা পৃথিবী বলিয়াই মনে হয়। হিমালয়ের বুকের এই নীড়ের সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন মনে হয়; এই স্কুল ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিজেদের পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেই অসীমা আশৈশব শিখিয়াছে। আজ দাদুর কথায় সে চমক খাইয়া ভীত হইয়া উঠিল: এ ব্যবস্থা তবে চিরস্থায়ী নয়। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটাই একটা বিপজ্জনক শৈলচূড়ার ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে; যে কোনও মুহূর্ত্তেই তাহা মহাশূন্যের মধ্যে গড়াইয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইতে পারে। দাদুর কথা বেদনাদায়ক হইলেও অসত্য নহে। তাঁহার মৃত্যুর পর কোথা হইতে এই বিদ্যালয়ের খরচ আসিবে? স্কুল ফাণ্ড বা সাময়িক সাহায্য এত প্রচুর নয় যে, শুধু তাহা হইতেই ব্যয়-সঙ্কুলান হইতে পারে। তবে কি ইহার অবসান অবশ্যম্ভাবী? ইহাকে জীয়াইয়া রাখার কি উপায় নাই?

দিগন্ত পারের অস্পষ্ট পাহাড়গুলির মতো 'চিল্‌ড্রেন্স হোমে'র

ভবিষ্যৎটাও অস্পষ্ট এবং কুয়াসা-আচ্ছন্ন মনে হইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অসীমা তাহার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য পালনের জন্য ডর্মিটরিতে গিয়া ঢুকিল। দাদুর ঘরের পাশেই ছেলেদের ডর্মিটরি। আর মেয়েদের ডর্মিটরি অসীমার ঘরের পাশে। দুই ঘরেই গোটা ষোল করিয়া নেওয়ারের খাট দুই সারিতে লম্বালম্বি ভাবে সাজানো। নটার মধ্যে ছেলেমেয়েরা শুইয়া পড়ে। নানী আসিয়া রাত-কাপড় পরিতে সাহায্য করে, বিছানায় শুইলে গায়ে কম্বল টানিয়া দেয়, আলো নেবায়। বাচ্চারা ফিস্‌ফিস্ করিয়া কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে, তারপর ঘুমাইয়া পড়ে।

শুইতে যাইবার পূর্ব্বে প্রতিরাত্রেই অসীমা ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতে আসে। এমন রাত নাই যে, দু-এক বার ঘুম হইতে উঠিয়া দুই ঘরে পায়চারি না করিয়া যায়। এতগুলি অসহায় শিশুর সে বড়ো দিদি; তার সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে চলিবে কেন।

বিছানার পর বিছানার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। মাণিকের মাথাটা বালিশ হইতে পড়িয়া গেছে; মাথাটা বালিশের উপর তুলিয়া দিল। শিবু পা দাপ্‌ড়াইয়া বিছানার চাদর পাকাইয়া তুলিয়াছে; চাদর টান করিয়া গদির তলায় গুঁজিয়া দেওয়া কম বিপজ্জনক নহে, কারণ নিদ্রায়ও সে মোটর সাইকেল চালনায় ক্ষান্ত হয় না। ঝগড়াবাজ কানু কিন্তু আশ্চর্য্য শান্তভাবে ঘুমায়। প্রকৃতি হয় তো এইরূপ ভাবেই ক্ষতিপূরণ করেন। অসীমা একে একে প্রত্যেকটি ঘুমন্ত ছেলের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইল।

এক প্রান্তে বাদলের খাট। বাদল একেবারে সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলেও ছেলেদের লীডার। তার পদ-গৌরবের দরুণ সর্ব্ব শীর্ষে তার স্থান পাওয়ার অধিকার অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এইস্থান তাহাকে

দুর্ব্বলের রক্ষক হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে; ভূত-পেত্নী রাক্ষস-খোক্কস ডাকাত এবং জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে সে মেয়েদের ঘরের পশ্চিম দুয়ার রক্ষা করিয়া থাকে।

সম্প্রতি এই 'নাইট্'টি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বীরত্বপূর্ণ কি একটা বক্তৃতা দিতেছিলেন। বাদলের ঐ এক রোগ। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কথা বলিবে। বীরত্ব মানুষের মাথা কতটা গরম করিয়া তুলিতে পারে, ইহা তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন। অসীমা সহাস্য ও স-উদ্বেগের মাঝামাঝি একটা মনোভাব লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শৈশব-লক্ষণ দেখিয়া যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তবে বাদল হয়তো এক-দিন জন-নেতা হইবে—অসীমা মনে মনে ভাবে। যে বীরত্ব এবং ঔদার্য্য, বুদ্ধি এবং সহানুভূতি নেতার অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ, বাদলের মধ্যে এরই ভিতর তাহার স্ফুরণের আভাস দেখা যাইতেছে। ইহাকে লালন করিয়া বিকশিত করার ভার শিক্ষকের উপর। ইহা শিক্ষকের মহান দায়িত্ব এবং গৌরব। কিন্তু আর কত দিন এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে? অসীমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। যে ঝড় উঠিয়া নীড় ভাঙিয়া যাইবে, তাহা আর কতদূরে কে জানে!

গায়ে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া, চুলভরা মাথাটা আঙুল দিয়া আঁচড়াইয়া অসীমা বাদলকে শান্ত করিল। কম্বলটা ভাল করিয়া টানিয়া দিল, তারপর নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলিয়া আসিল।

'ও কি ময়না? কাঁদচিস নাকি? এখনও ঘুমোস্ নি! কাঁদচিস্ কেন? কি হয়েচে?' ঘুমন্ত বালিকাদের খাটগুলির মধ্যবর্ত্তী অপরিসর গলিতে সফর অসমাপ্ত রাখিয়া অসীমা ছোটগিন্নী ময়নার

খাটের কাছে পৌঁছিয়া তার শিয়রে বসিয়া পড়িল, এবং উহার ক্ষুদ্র হাতটা নিজের মুঠার মধ্যে লইল।

'ভয় করচে, দিদি', ময়না কাঁদো-কাঁদো ক্ষীণ অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল। 'বড্ড ভয় করচে।'

'ভয় করচে কেন! দূর! এমন ভীতু মেয়ে! ভয়ের কি আছে। দেখছিস না ঘর-ভরা লোক?' অসীমা স্নিগ্ধকণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিল। 'আচ্ছা তুই ঘুমো; আমি এখানে বসে আছি। কিছু ভয় নেই। মাথায় আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিচ্চি।'

'ঘুমোলে তুমি চলে যাবে, দিদি।' ময়না চাপা কান্নায় বিকৃত গলায় কহিল।

'আচ্ছা ভীতু মেয়ে হয়েছিস তো!' অসীমা অননুমোদন সহানুভূতিতে আর্দ্র করিয়া কহিল। 'বোকা মেয়েরাই শুধু ভয় পায়। ভয়ের কিচ্ছু নেই, অথচ তারা মনে করে, ভয়ের অনেক কিছু বুঝি আছে।...আয়, আমার সঙ্গে আয়। কিন্তু রোজ নয়। একা একা শুয়ে ভয় ভাঙতে হবে...'

ময়না আর কাল বিলম্ব করিল না। দিদির কাছ হইতে এই আহ্বানেরই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কম্বল সরাইয়া খাটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। অসীমা তাহাকে কোলে লইয়া কম্বল দিয়া ভালো করিয়া জড়াইয়া লইল; অন্যান্য মেয়েদের দিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল, এবং কাহাকেও বড় রকম অসুবিধাগ্রস্ত না দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া ময়নাকে লইয়া নিজের শোবার ঘরের দিকে যাত্রা করিল।

পরম স্বস্তিতে ময়না দিদির কাঁধে মাথা কাৎ করিয়া দিল; আর কোনও উচ্চবাচ্য করিল না।

চার

দার্জ্জিলিঙের বৃষ্টি যতই আহ্লাদে ছিঁচ্‌কাঁদুনে হোক্, এই কথাটি ভালো করিয়াই জানে যে, সীজনের সময় ভদ্র-আচরণ করিতে না শিখিলে সারা দার্জ্জিলিঙের সব চেয়ে বড়ো ব্যবসাই মাটি হইবে; ভিজিটরেরা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে, এবং সম্ভাব্য আগন্তুকেরা এদিকে আর পা বাড়াইবে না। শহরের হিতের কথা বিবেচনা করিয়াই যেন বৃষ্টির দেবতা ক্রমে শিষ্ট আচরণ আরম্ভ করিল। গত কয়দিন ধরিয়া চক্‌চকে রৌদ্রে বৃষ্টিস্নাত পাহাড় এবং সবুজ অরণ্য যেন ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। দু'একদিন দ্বিধা এবং সঙ্কোচ করিয়া উত্তর আকাশে বুড়ো কাঞ্চনজঙ্ঘাও আজ ভোর হইতে হঠাৎ দেখা দিয়াছেন। একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়; ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে দেহের নানা জায়গায় মেঘের লেপ-কাঁথা-শাল-গলাবন্ধ জড়ানো। পাহাড়ী-আবহাওয়া অভিজ্ঞেরা বুঝিয়া লইয়াছেন, বর্ষার বড় রকম উপদ্রব এবারের জন্য থামিয়াছে।

রায়বাহাদুর কুমুদ চৌধুরি দার্জ্জিলিঙের একজন নিয়মিত অতিথি। বছরে অন্তত একবার তাঁহার হিমালয়ের কাঁধে আসিয়া চড়া চাই। সীজনে-সীজনে যাহারা এই পার্ব্বত্য-শহরে বেড়াইতে আসে তাহাদের শতকরা সত্তরটি পরিবারের কাহারও না কাহারও সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে। দশ বৎসর আগে ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আর কোনও কাজ নাই; কিন্তু চিরকেলে কাজ করার

অভ্যাস কিছুতেই দমন করা যায় না। ফলে, লোকের সঙ্গে তিনি যাচিয়া আলাপ করেন, উপদেশ দেন, পুত্রকন্যার বিবাহে সহায়তা করেন এবং ইংরেজের চাকরি করার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহাদের গাল দিয়া ভূত-ছাড়া করেন।

দার্জ্জিলিঙের রৌদ্র দুই দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবার পর তিনি ইহাকে অনেকটা নির্ভরযোগ্য মনে করিলেন। যাবতীয় শীতবস্ত্র গায়ে উঠিল; কোনও ফাঁক দিয়া শীত প্রবেশ করিবার সামান্যতম উপায় রহিল না, এমনই মজবুত যুদ্ধসাজ। এই সাজে সজ্জিত হইয়া রূপায় বাঁধানো মোটা লাঠি পীচ্-বাঁধানো রাস্তার উপর নির্দ্দয়ভাবে ঠুকিতে ঠুকিতে তিনি তার ছাত্র-জীবনের বন্ধু মহেন্দ্র সেনের বাড়ি 'অরুণাচলে'র দিকে যাত্রা করিলেন।

'অরুণাচলে'র মসৃণ প্রশস্ত লন্-এ তখন ছাত্রছাত্রীদের উৎসব বাধিয়া গেছে। বিকেলের দুধপান করিয়া চাঙ্গা হইয়া তাহারা বৈকালিক ক্রীড়ায় মত্ত। এক প্রান্তের বড়ো ম্যাগনোলিয়া গাছটার তলায় শাদা বেতের চেয়ারে বসিয়া অসীমা উলের জাম্পার বুনিতেছে। এ সময়টা সে ছেলেমেয়েদের যথেচ্ছ হুটোপুটি করিতে দেয়; শাসন করিয়া ইহাদের ইচ্ছাকে খর্ব্ব করে না। কিন্তু দূরে বসিয়া ইহাদের উপর সর্ব্বক্ষণই নজর রাখে; কখনও বা উঠিয়া গিয়া উহাদের খেলায় যোগদান করে। তখন শিশুদের উৎসাহ দেখে কে!

ছেলেমেয়েরা কেহ দোল্‌নায় দুলিতেছে, কেহ 'স্লিপে'র উপর হইতে পিছ্‌লাইয়া পড়িতেছে; কেহ সবুজ ঘাসের উপর ডিগ্‌বাজি খাইতেছে; টুটু, ইনু আর ময়না মাঠের মধ্যখানে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য শুরু

করিয়াছে। কানুর ইচ্ছা ইহাতে বাধা দেয়, কিন্তু এখানের সব কিছুই দিদি স্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছে জানিয়া ইচ্ছাকে সে আর কার্য্যে পরিণত করিল না; কোথা হইতে একটা লম্বা কাঠি জোগাড় করিয়া ফুলের বিভিন্ন বেড্-এ অনাবশ্যক খোচা মারিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সকলে যে এইরূপ অর্থহীন অসার কার্য্যের পক্ষপাতী নয়, তাহা চীফ্ অব্ স্টাফ্ নন্তুর প্ল্যাটুন্ লক্ষ্য করিলেই টের পাওয়া যায়। অন্তত এক ডজন ছেলেমেয়ে তাহার হুকুম মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া রীতিমত সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ করিতেছে।

'দিদি!'

'কি রে, বাদল!' চম্‌কাইয়া বয়ন বন্ধ করিয়া অসীমা তাকাইল।

'একদিন আমাদের বার্চ হিল্-এ নিয়ে যাও না. দিদি!' বাদল অ্যাটেন্‌শনে দাঁড়াইয়া কহিল।

'বার্চ হিল্! সে তো অনেক দূর।'

'দূরই তো চাই, দিদি।' বাদল কহিল। 'দূরের পথ না হলে কি রুট্-মার্চ করা যায়! সৈন্যদল গড়তে হলে কষ্ট সইতে শেখা চাই, চাই না দিদি?'

'তা চাই বৈকি!' অসীমা সহাস্যেই কহিল। 'কিন্তু যারা তোর সৈন্য-দলের লোক নয়, তাদের কি হবে? তারা অত কষ্ট করতে পারবে কেন!'

'তারা!' না দমিয়া সেনাপতি কহিলেন। 'সিভিলিয়ান্‌রা! তাদের চৌরাস্তার বেঞ্চে বসিয়ে রেখে গেলেই হবে। তাদের জন্য আমরা—ওরে বাবা! কে আসচে রে! শত্রুর লোক বলে মনে হচ্চে! অ্যাটাক্ করব, দিদি?...'

'চুপ্, বাঁদর ছেলে কোথাকার!' উদ্গত হাস্য দমন করিয়া

অসীমা চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। দাতুর বন্ধু কুমুদদাতুর ঐ এক রোগ! পৃথিবীর যাবতীয় শীত-বস্ত্র গায়ে না চাপাইয়া তিনি ঘরের বাহির হইতে পারেন না। ওভারকোটের উপর পুরু শাল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, চিবুক পর্য্যন্ত পশমী গলাবন্ধে ঢাকা, মাথায় বাঁদর-টুপি যে কোনও মুখোসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। পরণের প্লাস্-ফোর্স নামক পাৎলুন হাঁটুর নিচে পৌঁছিয়াই নিজের সকল স্ফীতি চুপ্সাইয়া দিয়া পায়ের বুটের উপর অংশ শক্তভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছে।

যুযুৎসু-সেনাপতিকে যুদ্ধের এত বড় একটা সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া অসীমা তাড়াতাড়ি গেটের দিকে আগাইয়া গেল। বাদল ক্ষণকাল বোকা বনিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সহসা নিজেকেই আদেশ করিলঃ 'অ্যাবাউট্ টার্ণ। কুইক্ মার্চ।' এবং প্রত্যেকটি আদেশই যথাযথ পালন করিল।

প্রায় এক বছর পরে তুই বন্ধুর দেখা। রায়বাহাতুর কুমুদ চৌধুরি কলিকাতায় বাস করেন এবং সামাজিক কুটনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁর বক্তব্য অশেষ। ডাঃ সেন ধীর-স্থির লোক; বেশি কথা বলেন না. শুধু কখনও কখনও তু-একটা সহাস্য মন্তব্য করেন। কিন্তু রায়বাহাতুর কথা বলিতেই চান, শুনিতে চান না। অতএব তুই বিভিন্ন প্রকৃতির বন্ধুর সম্মেলন পরস্পরের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়া সর্ব্বদাই যথেষ্ট জমিয়া ওঠে।

'ঐ নিদ্রাটা নিয়েই যা হাঙ্গামা, নইলে ভালোই আছি।' রায়-বাহাতুর চেয়ারে ঘনীভূতভাবে বসিয়া কহিয়া চলিলেন। 'ক্ষিদে

আছে, চলতে ফিরতে কষ্ট নেই, কেনা-কাটা নিজেই করি। শুধু ঐ নিদ্রা-কষ্ট ; কিছুতেই ঘুম আসবে না। সারা রাত ঘুমেতে আমাতে যেন লড়াই চলতে থাকে।···তা এখেনে এসে বরঞ্চ ভালো আচি ; প্রথম রাত্তিরটা ঘুমোতে পারি। তোমার মতো সারা বছর শীতের রাজ্যে কাটাতে পারলে মন্দ হতো না···'

'বাধা কি। সংসার তো বহুকাল করলে, এবার না হয় তারও কাছ থেকে অবসর নিয়ে এস না।' ডাঃ সেন মৃদু হাসিয়া চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া কহিলেন।

'ওরে সর্ব্বনাশ, তার কি উপায় আছে! পারলে তো বাঁচতাম!' রায়বাহাদুর সাতঙ্কে কহিলেন। 'ছেলেরা বড়ো হয়েচে, উপার্জ্জন করচে, মেয়েদের বিয়ে হয়েচে ; তবু যে দিকেই চোখ না রাখব সেখানেই কোনও একটা অঘটন ঘটে বসে আচে। একদণ্ড উদাসীন থাকবার উপায় নেই। কি সময় পড়েচে দেখচ তো। ইংরেজ যাচ্চে, কিন্তু যাবার আগে মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্চে। খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, সরষের তেল, মায় হর্লিক্‌সের অভাব। হর্লিকস্ না হলে আমার ছোট নাতনী ঠাকুরুণের কোনও মতেই চলে না, অথচ হর্লিকস্ জোগাড় করতে উমেদারির অধিক লাঞ্ছনা···'

'নাতনীর জন্য ফরমাস খাটতে বড়ো ভালো লাগে, তাই না হে?' ডাঃ সেন চোখের কোণে দুষ্টুমি মাখিয়া কহিলেন।

'ঐ দেখ, সব তাতেই তুমি রগড় খুঁজে পাবে! তারপর আর কি খবর, শুনি? একটু যেন কাহিল কাহিল দেখাচ্চে···'

'বয়স তো কম হলো না!' ডাঃ সেন জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া কহিলেন। 'কোন্ লজ্জায় শরীরের বিকৃতি নিয়ে নালিশ করব। বরঞ্চ বড় রকম একটা আশ্বাস পাওয়া যাচ্চে। কানে

কানে, মনে মনে। জরা দূর হবে, বন্ধন দূর হবে, দৈহিক-মানসিক সকল অসামর্থ্য লোপ পাবে, তার আর বিলম্ব নেই। এ কি কম বড় আশ্বাস!'

এই আশ্বাসের কথায় কুমুদ চৌধুরি খুব আশ্বস্তবোধ করিলেন না। বয়সের হিসাবে ডাঃ সেনের সঙ্গে তাঁর বড় তফাৎ নাই অথচ বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ এখনও প্রবল। যে সংসার নিজের রক্ত দিয়া, শ্রম দিয়া, আকাঙ্খা দিয়া এত যত্নে গড়িয়া তুলিয়াছেন, চিরকাল তাহাকে তিনি আঁকড়াইয়া থাকিতে চান।

আলোচনার ধারা বদলাইয়া তিনি কহিলেন, 'নাতনীর বিয়ে দেবে? আমার হাতে ভালো পাত্র আছে। বলো তো, আমি তাদের কাছে কথা ওঠাই।'

'ওর একটা বিয়ে দিতে পারলে তো আমি নিশ্চিন্ত হই, কুমুদ', ডাঃ সেনের দৃষ্টিতে আগ্রহের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। 'দাও না একটা ভালো সম্বন্ধ করে। তোমরা রাজধানীর লোক, কত তোমাদের জানা-শোনা।'

'ছেলেটি চমৎকার,' রায়বাহাদুর বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভবানীপুরের পুরানো ঘর; দেখতে শুনতে তো খুবই ভালো; চালাক-চতুর, কিন্তু ফক্কর নয়; গুরুজনকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জানে। অতি সৎ স্বভাব। আর অবস্থার কথা যদি বলো, তা রীতিমত জমকালো। যুদ্ধের মরশুমে এক যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টারিতে কম করে' সে নিজে পঁচিশ-ত্রিশ লাখ টাকা করেচে। অগাধ পৈত্রিক সম্পত্তি তো আছেই। বাপই এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম করে গিয়েছিলেন, এখন ছেলেই তা চালাচ্চে। নিজেও বি-ই পাশ এঞ্জিনিয়ার। বাপ নেই,

৩

মা আছে। ভাই বোন নেই। নিজেদের প্রকাণ্ড বসত-বাড়ি ছাড়াও কলকতায় আরও পাঁচসাতখানা বাড়ি ভাড়া খাটচে। সব দিক থেকেই অতি উপযুক্ত পাত্র। আর ঐ শুনতেই দ্বিতীয় পক্ষ, নইলে এ বয়সের আগে আজকাল ছেলেরা বিয়েই করে না।···তুমি রাজি হও তো আমি বলে দেখতে পারি···'

ডাঃ সেন কিছুক্ষণ ইহার জবাব দিলেন না। লোভনীয়তার এমন দীর্ঘ তালিকার শেষে এমন ত্রুটির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অবশেষে তিনি দ্বিধা-যুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'তুমি তো জানো, কুমুদ, আমার দিদিমণি আমার কত বড় দুর্লভ ধন। দোজবরে তার বিয়ে দিতে কি মন চাইবে? আর তাকেই বা কি বলে আমি অনুরোধ করব। সে ভাববে, দাদু আমাকে কাঁধ থেকে নামাতে পারলে বাঁচে; ইস্কুলের ভার আর নিজে বইতে পারচে না দেখে বড়লোক খুঁজে বেড়াচ্চে।···আর মুস্কিল হয়েচে কি জানো, সত্যই আমি এমন কাউকে খুঁজছি যে এই প্রতিষ্ঠানের ভার নিতে পারে। দিন তো আর বেশি নেই। আমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই বিদ্যালয়ের অবসান ঘটবে, এ মনে করতে বড় দুঃখ পাই। তাই নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি বোধ হয় খোঁজ করচি। খোঁজ করচি এমন একজনকে যার এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেবার শক্তি আছে। দিদিমণি একথা জানে। আমার মনের যে কথা আমি নিজেও স্পষ্ট জানিনে, সে তাও জানে। তাই আশঙ্কা হয়। সে যদি মনে ক'রে বসে, এমন সম্বন্ধের প্রস্তাব আমার নিজের উদ্দেশ্যের সহায়ক বলেই আমি অনুমোদন করেছি, তবে তা বড় লজ্জার কথা হবে। এ জন্যই আমার দোজবরে আপত্তি, নইলে আর কোনও সংস্কার নেই···'

'আমি বলি শোন', রায়বাহাতুর না দমিয়া কহিলেন, 'তুমি একদিন অজিতকে চায়ে ডাকো। সে সেই ধরণের ছেলে যাকে দেখলেই পছন্দ হবে। নাতনীর সঙ্গেও তার আলাপ করিয়ে দাও। কিছুদিন জানাশোনার পর তোমাদের তুজনের কারোই কোনও কুসংস্কার বজায় থাকবে না, এ আমি জোর করেই বলতে পারি: হীরের টুকরো ছেলে অজিত। সেদিন দেখা হলো ম্যাল্-এ, হপ্তা-তুয়েক আছে বললে। ওর মা তো ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছেন। কলকাতা ছাড়বার আগের দিনও তাঁর সঙ্গে দেখা হলো; কত তুঃখ করলেন। এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করচে, অথচ কিছুতেই ছেলে আর বিয়ে করতে চাইচে না।...তারপর অজিতকে এখানে দেখেই হঠাৎ তোমার নাতনীর কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বয়সের দিক থেকে তো তুজনের একেবারেই বেমানান হবে না, চরিত্রের দিক থেকেও তুজনে বনবে বলেই মনে করি।...তুমি একবার তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। আজকে হলো গিয়ে শনিবার। কাল বিকেলের আগে আর যাওয়া হবে না। সে আছে এই মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলেই! তুমি বলো তো, সোমবার তোমার এখানে তাকে চা খেতে নিয়ে আসতে পারি...'

'বেশ তো, নিয়ে এসনা,' ডাঃ সেন অন্যমনস্কভাবে কহিলেন। 'অন্তত আমার ইস্কুলটা একবার দেখে যাক্।'

রায়বাহাতুর কুমুদ চৌধুরির অবসর-বিনোদনের ইহা অন্যতম প্রধান ব্যসন। নিজের ছেলেমেয়েদের ইতিপূর্ব্বেই তিনি বিবাহ দিয়া সারিয়াছেন। নাতি-নাতনীর বিবাহ দেওয়ার অপেক্ষায় তিনি বাঁচিয়া আছেন, এবং ইত্যবসরে বন্ধু-বান্ধব এবং আলাপিত ও আলাপিতাদের

পরিবারের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের কোনও সুযোগই ত্যাগ করিতেছেন না।

প্রজাপতির দৌত্যকার্য্য সমাধা করিবার পর তিনি আসন্ন সন্ধ্যা এবং শৈত্যের কথা সাতঙ্কে উল্লেখ করিয়া বালাক্লাভা টুপির সহায়তায় আবার নিজের মাথা, কপাল এবং ভুরুর অর্দ্ধেক উড়াইয়া দিলেন, এবং চামড়ার দস্তানায় হাত বর্ম্মাবৃত করিয়া লাঠি আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

'অ্যাটেন্‌শন্। আইজ রাইট্। স্যালুট্।' বাদল তাহার বাহিনীকে আদেশ করিল। মিত্র-পক্ষকে শত্রুপক্ষ মনে করিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছিল, সুযোগ পাইয়া দাদুর প্রস্থানোদ্যত জুজু-বুড়ির মতো বন্ধুটিকে সদলবলে মিলিটারি অভিবাদন জানাইয়া সে তাহা শোধ্‌রাইয়া লইল।

পাঁচ

সকাল হইতেই দার্জ্জিলিং শহর চক্‌চক্ করিয়া উঠিয়াছে। রৌদ্রের সোনা গায়ে মাখিয়া সুবেশ ও কলরবমুখর হাওয়া-পরিবর্ত্তনকারী স্ত্রী-পুরুষ বিচিত্র রঙিন স্রোতের মতো চৌরাস্তা ও ম্যালের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পাহাড়ের গাযে রঙিন ফুলের এবং কমার্শ্যাল রো'র প্রদীপ্ত শো-কেস্‌গুলিতে লোভনীয় পণ্যের সমারোহ; মানব ও পতঙ্গ-জাতীয় প্রজাপতিরা এই দুইয়ের মধ্যে কে কোনটির দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিবিধ বর্ণের জটিল আলখাল্লা পরিয়া লামারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে। খুকুমণিরা চলিয়াছে গাধার পিঠে টুং টুং শব্দ করিতে করিতে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাছের ও দূরের পাহাড়ে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দার্জ্জিলিঙে যাহারাই বেড়াইতে আসে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে তাহাদের প্রায় সকলেই এক-আধবার করিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া জন্তু-ধাবন-স্পৃহা তৃপ্ত করিয়া থাকে। এমন সুন্দর দিনে ঘোড়-সওয়ারের সংখ্যা যে অসম্ভব বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ঘোড়ার ছোক্‌রারা ঘোড়ায়-চড়া মক্কেলদের পিছনে পিছনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া মক্কেলদের সাহস এবং ঘোড়ার উপর নিজেদের মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করে। চার চার জোয়ান লেপ্‌চা কুলি মাত্র একটা রিক্সা ঠেলিয়া কাবু হইয়া পড়ে। রিক্সার সংখ্যা বেশি নয়; এগুলিতে

ধনী বৃদ্ধা বা অসুস্থ ব্যক্তি, অথবা সুস্থ স্থূলকায়া মহারাণীরা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। পরিচিতের সঙ্গে পরিচিতের দেখা হইতেছে, মাথা অথবা টুপি নাড়ানাড়ি হইতেছে। চৌরাস্তা ও ম্যালের নানাস্থানে বন্ধু-বান্ধবের জটলা বাঁধিয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিঙের সরকারী মিলনস্থল চৌরাস্তার মালভূমিখণ্ডে ঐশ্বর্য্যের চলন্ত প্রদর্শনী শুরু হইয়াছে। ফ্যাশান-দুরস্ত মহিলারা দেহে যে পরিমাণ সাজ-সজ্জা এবং মুখমণ্ডলে যে পরিমাণ অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে বুড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা মিট্‌মিট্‌ করিয়া না হাসিয়া পারিতেছে না।

পাহাড়ের দেবতা যেন আজ তার জাদু মেলিয়া দিয়াছে পার্ব্বত্য-নগরীর পথে-পথে ; সব চাইতে আল্‌সেকেও ঘরের বাহির করিয়াছে। অসীমাও আজ তার বাচ্চাদের লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ম্যালের দিকে সে মোটেই গেল না। চৌরাস্তার দুরন্ত ভিড ও ততোধিক দুরন্ত ঐশ্বর্য্য-বিলাস এড়াইয়া সে ইহাদের কয়েক স্তর নিচে লইয়া গেল। প্রথমে তারা গেল জন-বিরল মিউজিয়মে। সেখানে প্রচণ্ড আনন্দ এবং প্রচণ্ডতর কোলাহল করিয়া শিশুরা মৃত পতঙ্গ ও কীটের সংগ্রহ দেখিল ; অজস্র প্রশ্ন-পত্তর করিয়া অসীমা এবং মিউজিয়মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে নাস্তানাবুদ করিল, এবং মিউজিয়মের দ্রষ্টব্য দেখা সমাপ্ত করিয়া জেনারেল বাদলের নেতৃত্বাধীনে মার্চ্চ করিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে অভিযান করিল।

এখানে দুঘণ্টাব্যাপী অবাধ ছুটাছুটির অধিকার আগে হইতেই মঞ্জুর হইয়া আছে। এবার আর ইহাদের পায় কে! ঝোপঝাড়ের আড়াল-আবডাল লুকোচুরি খেলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; ছাঁটা সবুজ ঘাসের মখমল-বিছানো পাহাড়ের ঢালু পিঠ গড়াইবার এবং হামাগুড়ি দিয়া

উপরে উঠিবার পক্ষে আদর্শ স্থান। তা ছাড়া কত ফুল, কত প্রজাপতি, কত বিচিত্র রকম গাছপালা। লজ্জাবতী লতার পাতা ছুঁইতেই কি কম মজা! ছোঁয়া মাত্র কি আশ্চর্য্যভাবে পাতাগুলি বুজিয়া যায়, যেন সত্য-সত্যই এদের প্রাণ আছে! 'অরুণাচলে'র শিশুদের কাছে এই আবেষ্টন, এই অবাধ স্বাধীনতা, এই বৈচিত্র্য পরম আনন্দকর মনে হইল। পলকে তাহারা এই ঢালু পাহাড়ী উদ্যানের বিভিন্ন কোণে, বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়িল। উচ্চ হাস্যে, সাঙ্কেতিক আহ্বানে, ছুটোছুটি নাচানাচিতে দার্জ্জিলিঙের জন-বিরল বোটানিক্যাল গার্ডেন যেন যোগনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল।

সব চেয়ে নিচের স্তরে একটা ঝিলিমিলি ঝাউগাছের নিচে এক নির্জ্জন বেঞ্চিতে অসীমা আসন গ্রহণ করিয়াছে। এতটা নিচে নামিতে বাচ্চাদের আগেই নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অসীমা নিচে নামিয়া আসিয়া বসিয়াছে সাবধানতা হিসাবে। ছেলেদের ছুটোছুটির স্বাধীনতায় সে বাধা দিতে চায় না, কিন্তু একেবারে এত নিচে তাহারা না আসিয়া পড়ে সেদিকে নজর রাখা দরকার। এখানে অসীমার পড়া এবং পাহারা দুই-ই চলিবে।

শীঘ্রই শিশুদের কলহাস্য পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এখানে ওখানে, ঝোপের আড়ালে, গাছের পিছনে চঞ্চল আলেয়ার মতো তাহারা হঠাৎ দেখা দেয়, আবার হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হয়। হাত ধরাধরি করিয়া একদল 'মেরি-গো-রাউণ্ড' শুরু করে; অন্য দল পার্ব্বত্য রেলগাড়িতে পরিবর্ত্তিত হইয়া হুঁস্‌হুঁস্‌ করিয়া চড়াইয়ের পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতে থাকে; কেহ চিৎপাৎ

হইয়া ঢালু পাহাড়-পৃষ্ঠের কোমল সবুজ লন্-এ গড়াগড়ি যায়। এরই সঙ্গে মাঝে মাঝে কুচ্‌কাওয়াজ চলিতে থাকে। প্রজাপতির পিছনে ছুটাছুটি করিয়া সৈন্যদল বীরত্বের পরিচয় দেয়। আনন্দমুখর মুহূর্ত্তগুলি যেন পাহাড়ী টাট্টুর মতো কদম ছুটিয়া আগাইয়া চলে।

আলস্যের আমেজ লাগিয়াছে অসীমার মনে। বই, পাহাড়, উপত্যকা, চায়ের বাগান, পাইন ও ঝাউগাছ, রৌদ্র ও ছায়ার বর্ণ-বিন্যাস, শিশুদের দূরাগত ক্ষীণ আনন্দধ্বনি সব যেন তালগোল পাকাইয়া এক হইয়া উঠিয়া একটা অখণ্ড অনুভূতি হইয়া ওঠে। নির্জ্জনতা যেন নেশা ধরাইয়া দেয়। হাত-ঘড়িতে অসীমা কয়বার সময় দেখিল, কিন্তু উঠি-উঠি করিয়াও উঠিতে পারিল না। উঠিতে যেন ইচ্ছাই হয় না।

'গুড্ মর্ণিং, ম্যে আই সীট্ হেয়ার্?'

'ওঃ, শ্যিওর্, প্লীজ্ বি সীটেড্।' বলিয়া অসীমা চম্‌কাইয়া সজাগ হইয়া মধ্যবয়স্কা এক ইউরোপীয় মহিলাকে আসনের অনেকটা জায়গা ছাড়িয়া দিয়া ভদ্রতা প্রদর্শন করিল।

মেম সহাস্যে অসীমার পাশে বসিয়া পড়িল। প্রসন্ন কণ্ঠে কহিল, 'চমৎকার দিনটা হয়েচে, তাই না? এমন রোদ উঠলে মনের সব জড়তা কেটে যায়।'

অসীমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপনের ভঙ্গি করিল।

'আর কিঞ্চিন্‌জিংগার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। যেন উজ্জ্বল রূপো। এই সুন্দর আবেষ্টনে ঐ ওপরের দিকে যেসব শিশু খেলে বেড়াচ্চে, তাদের ঠিক স্বর্গীয় শিশু বলেই মনে হচ্চে। এমন সুন্দর হয় ছেলেপুলেরা! এরা কোন্ ইস্কুলের বলতে পার?'

'এরা সবই আমার দাদুর ইস্কুলের।' অসীমা সংক্ষেপে কহিল।

'ওহো, তবে তোমারই সঙ্গে এরা এসেচে। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে তবে তো বেশ ভালই হলো। তুমি যদি অনুমতি করো, তবে একদিন তোমার ইস্কুল দেখতে যাব। স্কুলের উন্নতি সম্পর্কে কিছু উপদেশও দিতে পারব আশা করি। আমিও এক সময় শিশু-দের শিক্ষা সম্বন্ধে ইন্‌টারেস্টেড্ ছিলাম; এক নার্সারি স্কুলে কিছুদিন পড়িয়েও ছিলাম। কিন্তু বেশি দিন এ-লাইনে থাকার সুযোগ হয় নি। রবার্টের সঙ্গে দেখা হলো। ছুটি নিয়ে সে দেশে এসেচে। আলাপ ভালোবাসায় দাঁড়াল। এন্‌গেজ্‌ড্ হলাম। তারপর একেবারে ক্লাইভ স্ট্রীটের বড়ো সাহেবের স্ত্রী হয়ে ভারতবর্ষে চলে এলাম। কিন্তু তখন কে জানত বড-সাহেবের স্ত্রী হওয়া এতটা 'ডাল্'। আমি সম্পূর্ণ ফেড্ আপ্।...এখানে আমি তিন মাস থাকব। বলতো অবসর সময়ে তোমার স্কুলে পড়াতেও পারি...'

অসীমা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করিয়া শুধু স্কুল-পরিদর্শনে যাইবার ভদ্রতা-সূচক আমন্ত্রণ করিল। বড়-সাহেবের গিন্নী খুসি হইলেন; নিজের স্বামীর অনেক গল্প করিলেন, গৃহস্থালির খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, ছোক্‌রা, আয়া, মালী, ঝাড়ুদারে তাঁহার মোট কতগুলি চাকরবাকর আছে তাহা ঘোষণা করিলেন। বহু ব্যক্তিগত কাহিনী প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার স্বামী অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহারা কোথায় গৃহ-পত্তন করিবেন, তাহা পর্য্যন্ত অসীমাকে শুনাইয়া দিলেন।

অসীমা বারবার ঘড়ি দেখিল, কিন্তু ইহাতেও মিসেস্ হাচিংস্ নিরস্ত হইলেন না। ইংরেজ মহিলার পক্ষে এটা একটু আশ্চর্য্যের

ব্যাপার, কিন্তু তিনি নিজেই কি বলেন নাই, দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে রৌদ্র ওঠায় মনের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে।

অগত্যা অসীমা কহিল, 'এবার আমাকে উঠতে হবে। নইলে ছেলেদের খাওয়ার দেরি হয়ে যাবে। একদিন যদি স্কুলে আসেন, আনন্দিত হবো।'

'নিশ্চয়ই যাব। আই উড্ লভ্ টু গো।' মিসেস্ হাচিংসও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন। 'তোমাদের স্কুল-হাউসের নামটা কি বল্লে— অ্যারুণাচ্যাল! তোমার সুন্দর নামটাও আমার মনে থাকবে: অ্যাসীমা! দা লিমিট্লেস ওয়ান্! পূর্ব্বটা সত্যই রহস্যের দেশ!'

অসীমা আর কথা না বাড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া আগাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় গেল বাচ্চারা! আশেপাশে তাহাদের একজনও নজরে পড়িতেছে না! কই, হাঁক-ডাক চেঁচামেচিও তো আর শোনা যাইতেছে না! মিসেস্ হাচিংসের সহিত কথা-বার্ত্তায় অসীমা পনেরো-কুড়ি মিনিট, বড় জোর আধ ঘণ্টাকাল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সুযোগে বাচ্চারা কোথায় গা ঢাকা দিল?

অসীমা একটু অস্বস্তিই বোধ করিতে লাগিল। এদিকে তাকাইল, ওদিকে তাকাইল, চারদিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে করিতে চড়াইয়ের পথে প্রায় ছুটিয়া চলিল। এতগুলি ছেলেমেয়ের পক্ষে কি এমন ভাবে লুকান সম্ভব? রাস্তা, ঝোপঝাড়, পাহাড়ের ঢালু লন্ যতটা নজরে পড়ে কোথাও কাহারও টিকি দেখা গেল না। অসীমার অনুমতি না লইয়া ইহারা বাড়ি ফিরিয়া যাইবে, ইহা অবিশ্বাস্য। তবে কি কাহারও কোনও বিপদ-আপদ হইল? শিশুরা কি বিপদের ঘটনাস্থলে গিয়া জড়ো হইয়াছে? ভয়ে অসীমার বুক

টিপ টিপ করিতে লাগিল। নিজেকে মহা অপরাধী মনে হইল। এতগুলি শিশুর তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া তাহার কি গল্পে মাতিবার অধিকার ছিল? বড়লোকের বহু গিন্নী তাহার প্রতিষ্ঠানের প্রতি বহু মৌখিক সহানুভূতি জানাইয়াছে; সহানুভূতির স্বরে আকৃষ্ট হইয়া তাহার কি এতটা অন্যমনস্ক হওয়া উচিত হইয়াছে?

অসীমা তটস্থ হইয়া উঠিল। এতগুলি ছেলেমেয়ের একজনকেও বাগানের কোথাও দেখা যাইবে না, এ-ও কি বিশ্বাসযোগ্য! কোথায় গেল সব! ক্রমে অসীমা ইহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে শুরু করিল; উচ্চ হইতে ক্রমোচ্চ স্বরে ডাকিল। কিন্তু কোনও সাড়া আসিল না। উপরের স্তরে পৌঁছিলে সারা বাগানের দৃশ্য সমগ্রভাবে চোখে পড়িবে; কিন্তু যদি সেখান হইতেও ইহাদের কাহাকেও দেখিতে না পাওয়া যায়! উদ্বিগ্ন মায়ের আশঙ্কার মতো একরাশ অমূলক ভয় অসীমার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিল।

'বাদল, দিদি! দিদি!' এবারেও বাদলের ইণ্টেলিজেন্স অফিসার গনুই সাতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠিল।

বছর পঁয়ত্রিশের একজন দীর্ঘকায় সবল সহাস্য যুবকের চতুর্দ্দিকে ডাঃ সেনের শিশু-বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র বাসিন্দারা একযোগে ভিড় করিয়া তাহার হাত হইতে চকোলেটের এক একটি বড়ো প্যাকেট উপহার আদায় করিতেছিল। একপাশে চকোলেট-বিক্রেতা নেপালী ছোকরা আকর্ণ হাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দণ্ডায়মান; তাহার এক সপ্তাহের উপযুক্ত মাল যে মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া যাইবে, ভোরবেলায় বাগানের মালীর খাটিয়ার তলায়

রাখা প্যাকিং-কেস্ হইতে মাল আনিবার সময় তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু কোথা হইতে আসিল এই 'বাবারা', কোথা হইতে আমদানি হইল এই সাহেব, অদ্ভুতভাবে ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইল! তাহার এক সপ্তাহের স্টক্ চক্ষের পলকে উড়িয়া গেল। খুব দিল্‌দরিয়া সাহেব! 'বাবারা' যে যতটা চাহিতেছে, বিনা আপত্তিতে কিনিয়া দিতেছে। নাচানাচি লাগিয়াছে, টানাটানি পড়িয়াছে; যে একবার পাইয়াছে, সে আরও চাহিতেছে: যে পায় নাই, সে কাছে আগাইয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে। যেন মহোৎসব শুরু হইয়াছে। যথেচ্ছ ছুটোছুটি করিবার এমন সুযোগের সঙ্গে যদি এমন চকোলেট-যোগ ঘটে, তবে আনন্দে আত্মহারা না হইয়া আর উপায় কি। কিন্তু গন্নুর কর্ত্তব্যের কামাই নাই। সহসা তাহার কণ্ঠের তীক্ষ্ণ সাবধান-বাণীতে উৎসবমত্তেরা সচকিত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে মহোৎসব তচনচ হইয়া গেল। চোরের একটা দল যেন হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া প্রমাদ গণিয়াছে।

'অজিতদা, আর রক্ষা নেই। দিদি!' বাদল একবার দ্রুত পিছনে তাকাইয়া দেখিয়া ধরা-পড়া সেনাপতির হতাশার সঙ্গে কহিল। 'তখনই তোমাকে বল্লুম, কাজ নেই চকোলেট খেয়ে। তোমাকে আমরা আগে কক্ষনো দেখিনি। তবু তুমি বল্লে, "না খাও। কিচ্ছু হবে না।" —বলিনি?'

'তা বলেছিলে বৈ কি!' যুবকটি বাদলের উদ্বিগ্ন মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যেই কহিল। 'নিশ্চয় বলেছিলে।'

'তুমি বল্লে,' বাদল তাহার সঙ্গীদের দিকে একবার সমর্থনের জন্য নীরব আবেদন জানাইয়া সকল অপরাধীর মুখপাত্র হিসাবে কহিল,

'তুমি বল্লে, "কিচ্ছু ভয় নেই। দিদি বকলে আমি বলে দেব এখন। বলব, ওরা খেতে চায়নি, আমিই জোর করে' দিয়েচি।"...ব্যস্, এইবার তবে বলো। সত্যি কথা বলো। বলো গিয়ে, আমাদের কোনও দোষ নেই, দেখি কেমন তোমার সাহস...'

'আরে তুমিই তো আই, এন্-এর কমাণ্ডার বল্‌লে,' অজিত গম্ভীর-ভাবে কহিল, 'সাহস আমার থাকবে কি। সাহস তোমার থাকা চাই।'

'না, অজিতদা, তুমি ও-রকম করো না,' ময়না কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল। 'তবে দিদি আমাদের বড়ো বক্‌বে...'

'আমি বলব, আমি খাইনি,' কানু ঘোষণা করিল। 'দেখ আমার হাত, দেখ আমার মুখ...'

'খাওনি কি রকম?' ডলী প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। 'তুমি দু প্যাকেট নিয়েচ; তার ওপর রুবিরটা থাবিয়ে খেয়েচ। খাওয়া শেষ ক'রে বড়ো সাধু সেজেছ, না? তোমার কথা দিদির বিশ্বেস করতে বয়ে গেছে।'

নন্তু কহিল, 'ভীরু কোথাকার! খেয়ে স্বীকার করবার সাহস নেই! আমরা আই, এন, এ; ম'রে যাব, তবু বেইমানী করব না।...'

ইতিমধ্যে অসীমা কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। দ্রুত চড়াইয়ের পথে ছুটিয়া আসায় স্পষ্টই হাঁপাইতেছে সে। মুখটা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন অপরিচিত যুবকের চারদিকে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত বোধ করিলেও, ইহাদের নিরাপদ দেখিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের হাতের দিকে তাহার নজর পড়িল। অসীমা

স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে লাল প্যাকিং কাগজে মোড়া চকোলেটের মোড়ক। কি সর্ব্বনাশ! এতগুলি চকোলেট উহার কাছ হইতে আদায় করিয়াছে নাকি! এ যে কম করিয়াও পঁচিশ-ত্রিশ টাকার ব্যাপার! লজ্জায় অসীমা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল! এই কি তার শিক্ষার ফল! তাহার দৃষ্টির আড়াল হইলে তার ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে এমন ক্যাংলাপনা করিতে পারে! অসীমার যেন কান্না পাইল।

'বাদল!'

'দিদি!'

'শুনে যাও। এখেনে এগিয়ে এসো।'

কিন্তু বাদলের আগেই চকোলেট-দাতা বাদলের কনুয়ের জরুরি গুঁতা খাইয়া নিজেই আগাইয়া আসিল। কপালে জোড় হাত ঠেকাইয়া সহাস্যে কহিল, 'দেখুন, যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে, তবে তা আমার; এদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি জোর ক'রে এদের চকোলেট উপহার দিয়েচি অভয়ও দিয়েচি। যদি শাস্তি দিতে হয়, তবে তা আমারই পাওনা।'

'কেন মিছিমিছি এতগুলো টাকা নষ্ট করলেন।' অসীমা বিব্রত হইয়া, কিন্তু গম্ভীরভাবে কহিল।

'ব্যয় করেচি, কিন্তু নষ্ট করিনি।' যুবকটি প্রসন্নমুখে কহিল। 'এত আনন্দ পেলাম, এত আনন্দ দিলাম, তার মূল্য কি কম?'

'না, দেখুন, এ ঠিক নয়।' অসীমা দৃষ্টি না তুলিয়াই কহিল। 'এমন লোভী হয়ে উঠতে তো এদের আমি শিখাইনি। এমন সব দুষ্টু হয়েচে!'

'আমিই এদের প্রলুব্ধ করেচি।' যুবক কহিল। 'এদের সঙ্গে

ভাব করবার লোভ আমিই সংবরণ করতে পারিনি। দার্জ্জিলিঙের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠেচি। যেখানেই যাই, কলকাতার চেনা লোক কিলবিল্ করচে! ওদের ভয়ে আমি সর্ব্বক্ষণ পালিয়ে বেড়াই! কেন এখানে হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছিলাম ভেবে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই। আজ ভিড় এড়াবার জন্যই এইখেনে পালিয়ে এসেছিলাম। হঠাৎ এখানে আমার এতগুলি ছোট্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! মনের আনন্দ আর চাপতে পারলুম না। তার ফলে, আপনার কাছে অপরাধী হয়ে পড়েচি…'

'ঠিক আছে।' বলিয়া অসীমা একবার উহার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, এবং পরক্ষণে বাচ্চাদের দিকে চাহিয়া কহিল, 'চলো, এবার সব বাড়ি চলো। বাড়ি পৌঁছতে আজ খাওয়ার টাইম পার হয়ে যাবে।…আচ্ছা, আসি।'

'নমস্কার।'

অপরাধ মাফ্ হইয়াছে। সকলে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। শিশুদের ভিড়ের মধ্য হইতে 'অজিতদা, নমস্কার', 'অজিতদা, যাচ্চি,' 'অজিতদা, একদিন এসো কিন্তু,' প্রভৃতি ধ্বনি উঠিল। অজিতদার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেছে। কৃতজ্ঞতা তো আছেই; কি ফাঁড়াটাই না আজ কাটিয়া গেল! কিন্তু দিদিকে এমন সহজে সামলানোই কি চাট্টিখানি কথা!

বাদল হাঁকিল, 'অ্যাটেন্‌শন্। আইজ্ লেফ্‌ট্। স্যালুট্। কুইক্ মার্চ্চ।'

অজিত সারা মুখ কৌতুক-হাস্যে পূর্ণ করিয়া, ডান হাত "স্যালুটে"র

স্বীকৃতিতে উঁচু করিয়া উঠাইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আশ্চর্য্য মিষ্টি এই ছেলেমেয়েগুলি! বড় ভালো লাগে তার ছেলেমেয়েদের। তার নিজের যদি একটি সন্তান থাকিত, তবে হয়তো জীবনটা এমন ফাঁকা, এমন অর্থহীন মনে হইত না। জীবনে যদি কোনও বন্ধন না থাকে, তবে কি লইয়া বাঁচা যায়! দুর্ভাগ্যের দাপটে তার জীবনটা কি সম্পূর্ণভাবেই না চুরমার হইয়া গিয়াছে!

ছয়

বিকাল ছ'টা। দার্জ্জিলিঙ আজও তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বৃষ্টিহীন একটা সুন্দর দিনের শেষে বুড়ো কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া উত্তর দিগন্তে সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের কোথাও ফগের লেশমাত্র নাই। কার্ট রোডের নিচে গভীর খদের দিকে যে সকল পাহাড়ী পায়ে-চলা কাঁচা রাস্তা সর্পিল ভঙ্গিতে অদৃশ্য জনপদে নামিয়া গিয়াছে, একটু চেষ্টা করিলেই আজ তাহার সব ক'টি নজরে পড়িবে।

'অরুণাচলে'র চওড়া লাইব্রেরি ঘরে চায়ের টেবিলের তুদিকে পরস্পরের মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন তুই বৃদ্ধ—ডাঃ সেন ও তাহার পরোপকার-উৎসুক বন্ধু রায়বাহাতুর কুমুদ চৌধুরি। আব্‌হাওয়ার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া অথবা নিমন্ত্রণ-সভার সম্মানে তিনি মাথার বাঁদর-টুপি বিসর্জ্জন দিয়াছেন সঠিক বলা যায় না, কিন্তু ইহার ফলে তাহাকেও দার্জ্জিলিঙ শহরের মতোই উজ্জ্বল মনে হইতেছে!

চা একটু পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছে। নানী ও তাহার স্বামী চৌকিদার মানবাহাতুর চায়ের সরঞ্জাম এবং ব্যবহৃত পেয়ালা-পিরিচগুলি সরাইয়া লইতেছে। চায়ের অপর তুই ধারে তুটি চেয়ারই শূন্য, কিন্তু তাহাদের সম্মুখে এখনও ব্যবহৃত প্লেট-পেয়ালা পড়িয়া থাকায় চেয়ার তুটি যে কিছু পূর্ব্বেও খালি ছিল না, তাহা স্পষ্টই সূচিত করিতেছে।

'কি রকম দেখলে ছেলেটিকে ?'

'বেশ।'

'চমৎকার! অতি চমৎকার!' রায়বাহাদুর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কহিলেন, 'দেখেচ, কি রকম বিনীত। এমন বিনীত ছেলে আজকালকার দিনে কটা দেখা যায় ? অথচ এই অল্প বয়সে নিজে সে যে-আন্দাজ টাকা কামিয়েচে, তাতে অন্য কেউ হলে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। ওর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করেচ ? হাসি লক্ষ্য করেচ ? যেমন সারল্য, তেমনি বুদ্ধির ছাপ···'

'বেশ ছেলে।' ডাঃ সেন দূরের স্কুল-বাড়ির দিকে অলস-চোখে চাহিয়া আবার কহিলেন। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়, কিন্তু চায়ের আসরের এই নতুন অতিথিটির বুদ্ধি-উজ্জ্বল মুখ ও ভদ্র-আচরণে বৃদ্ধ খুসি হইয়াছেন; একটু যেন বেশিই খুসি হইয়াছেন। কিন্তু তবু মনটা খুঁতখুঁত করিতেছে। জোরের সঙ্গে তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অসীমা যেন না মনে করিতে পারে, দাদু তাহাকে দোজবরেই সমর্পণ করিতে চায়।

'কিন্তু তাকে ধরে আনতে পারা কি কম হ্যাঙ্গাম!' রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন। 'কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্চি, আজ না গেলে চলে কিনা, নানান্ প্রশ্ন-পত্তর। কিন্তু আমিও জবাব দেবার পাত্র নই। বল্লুম, উঁহু, কোনও প্রশ্ন নয়। এখানে এক রকম আমিই তোমার গার্জ্জেন, যেখানে নিয়ে যাব, সেখানেই যেতে হবে।···তারপর তোমার বাড়ির নামটা পড়েই তো ভারি খুসি। বল্লে, 'অরুণাচল!' এই স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে আমার ভাব হয়ে গেচে! বাঃ,

এ তো চমৎকার যোগাযোগ ! মুখে আর আমি কিছু বল্লুম না, মনে মনে বল্লুম, যোগাযোগটি ঠিক হলে আমিও যে বাঁচি।' বলিয়া কুমুদ চৌধুরি দেহ কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'দিদিমণি যদি জানতে পারে এর পেছনে আমাদের মতলব আছে, এ শুধু অতিথি-সৎকার নয়, তবে সে আবার চটে' না ওঠে, কুমুদ।' ডাঃ সেন ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন। 'তার চেয়ে তাকে আগেই স্পষ্ট করে' বলে' দিলে ভালো হতো। তুমি তো জানো না, এ আমার কি রকম অভিমানী মেয়ে !...'

'ঐ করেই তো তুমি মেয়েটাকে চিরকালের আইবুড়ো করে' রাখবার ব্যবস্থা করেচ।' রায়বাহাদুর মৃদু তিরস্কারের স্বরেই কহিলেন। 'মেয়ে বড়ো হয়েচে ; অমন স্পষ্ট করে' বললে সে তো লজ্জা পাবেই। তার চেয়ে এই ভালো, কোনও সম্বন্ধের কথা না ভেবে সহজভাবে একটু মেলামেশা করুক, দেখো বাকিটা কত সহজ হয়ে ওঠে। অজিতের মতো ছেলের সঙ্গে যে-ই মিশবে, সে-ই মুগ্ধ হবে। তাই তো নাতনীকে বল্লুম, যাও তো মা, নতুন অতিথিটিকে তোমার ইস্কুল-বাড়ি দেখিয়ে আনো।...ছেলেমেয়েদের কি করে' বিয়ে দিতে হয়, তা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। এ তোমার কাজ নয়...'

স্কুল-বাড়ির এক ঘর হইতে অন্য ঘরে অসীমা তাহার অতিথিকে লইয়া গেল ; তাহাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিল এবং ছেলে-মেয়েদের কাজের নমুনা প্রদর্শন করিল। জানালা দিয়া তাকাইলেই সুদূর পাহাড়ের তরঙ্গ চোখে পড়ে। দীর্ঘকায় পাইন গাছের সারি যেন নিকট ও দূরের সীমানা-রেখা টানিয়া দিয়াছে। জানালার কাছে

আগাইয়া গেলে, কার্ট রোড্ এবং পাহাড়-পৃষ্ঠের পুঞ্জীভূত বাড়িগুলি নজরে পড়ে! যেন দূর হইতে বৃহদাকার তৈল-চিত্র দেখা হইতেছে।

'এমন ভাবে যে আপনাদের বাড়িতেই চা খেতে আসব, এত বড় আশ্চর্য্য যোগাযোগের কথা কখনও কল্পনা করিনি,' এক ক্লাস-ঘর হইতে অন্য ক্লাস-ঘরে অসীমাকে অনুসরণ করিয়া অজিত অকৃত্রিম সরলতার সঙ্গে কহিল। 'সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে অরুণাচলের ছোট বন্ধুদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, একদিন তাদের বাড়িতে হাজির হবো। কিন্তু এত শীগ্‌গিরই যে সেই প্রতিশ্রুতি-পালনের সুযোগ উপস্থিত হবে, তা কে ভেবেছিল…'

'দেখুন একবার পেছনে তাকিয়ে, তারাও সবাই হাজির।' অসীমা কৌতুক-দীপ্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ইঙ্গিতে পশ্চাৎদিকটা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল। 'স্টিমারের পেছনে যেমন গাধা-বোট চলে, আপনার বন্ধুরাও তেমনি আপনার পিছু নিয়েচে। শুধু আমার ভয়েই এগুতে পারচে না…'

অজিত তাড়াতাড়ি পিছনে তাকাইল। দেখিল, যে ঘরটি তাহারা সদ্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার ওদিকের দরজার মুখে জন পনেরো মানবক-মানবিকা পা টিপিয়া-টিপিয়া আগাইয়া আসিতেছে। নানা রকম চাপা ফিস্‌ফাস্ তাহাদের চাপা উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া দিতেছে; অথচ প্রকাশ্যভাবে সামনে আগাইয়া আসার সাহস একজনেরও নাই। স্কুল-পরিদর্শনের জন্য কোনও ভিজিটর্ আসিলে তার আশেপাশে ভিড় করা নিষেধ। নইলে এতক্ষণে কি আর তাহারা পাহাড়ী-ঝর্‌নার মতো ঝাঁপাইয়া পড়িত না।

অজিত পিছনে তাকানো মাত্র এই অধীর জনতার মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। অধিকাংশ কচি মুখই ইহাকে পরিচয়-স্বীকৃতি জ্ঞান করিয়া খুসিতে উজ্জল হইয়া উঠিল।' 'দেখেচে, দেখেচে।' 'চুপ্, চুপ্, দিদি বকবে।' 'অজিতদা, আমাদের চেনো না, আমরাই সেই আমরা,' প্রভৃতি চাপা কথা স্টেজ-হুইস্পারের মতো স্বস্পষ্ট শোনা গেল।

অজিত অসীমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'আস্থক না এরা কাছে, মিস্ সেন। এদের কাছে ডাকলে কি আপনার স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করা হবে?'

অসীমা ইহার কোনও জবাব না দিয়া পিছনে ফিরিয়া কহিল, 'এস। এগিয়ে এস।'

ব্যস্, এক মুহূর্ত্তে দামোদর নদীতে বান ডাকিয়া গেল। প্রথমে উহারা বেশ একটু শঙ্কিতই বোধ করিয়াছিল, কিন্তু দিদির মুখে প্রশ্রয়ের চিহ্ন দেখিয়া পরক্ষণেই তাহারা আশ্বস্ত হইল। পলকে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর মতো ছুটিয়া আসিয়া ইহারা অজিতকে ঘিরিয়া ফেলিল; উচ্চহাস্যে, সোল্লাস সম্ভাষণে, আকর্ষণে, আলিঙ্গনে একটা মাতামাতি শুরু হইয়া গেল। চারিদিক হইতে অবিচ্ছিন্ন আহ্বান আসিতে লাগিল: 'অজিতদা,' 'অজিতদা,' অজিতদা'।

উল্লাসের ঝড় কমিলে অজিত ইহাদের সম্বোধন করিয়া কহিল, 'তোমরা সব ভালো আছো তো? বাদল, বুলু, ডলী, ময়না, টুটু, নন্তু, কানু, হাসি, নানা, গণু···দেখতো, কেমন তোমাদের নাম আমার মনে আছে। আর কি রকম তাড়াতাড়ি তোমাদের নিমন্ত্রণটা রক্ষা করলুম। চকোলেটের বদলে স্যাণ্ড্উইচ্, সিঙাড়া, কেক্, চা কত কিছু খেয়ে গেলুম···'

'আজকে তুমি আমাদের এখানে থাকবে? থাকো না, অজিতদা।' ময়না হাত ধরিয়া আব্দারের সুরে কহিল।

'দূর বোকা, আম্‌াদের এখানে শোবার জায়গা কোথায় যে থাকবে।' কানু বিজ্ঞের মতো কহিল।

'কেন, হল-ঘরের সোফাটা আছে না?' ডলী প্রথামত এবারও কানুর উক্তির প্রতিবাদ করিল। 'সেবারে যখন দিদির মামা এসেছিল, তখন কোথায় শুয়েছিল? জায়গা আর থাকবে না কেন। কিন্তু অজিতদার বুঝি আর নিজের বাড়ি নেই যে এখানে থাকবে!'

'বাড়িতে তোমার কে আছে, অজিতদা?' রুবি নামক মেয়েটি পাকা গৃহিণীর মতো ভারিক্কি স্বরে প্রশ্ন করিল। 'ছেলে আছে? মেয়ে আছে? একদিন তাদের নিয়ে এসো, আমাদের সঙ্গে খেলবে।'

'তাদের একদিন নিয়ে এসো না, অজিতদা।' ময়না নাকী সুরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল।

অজিত ম্লান হাসিয়া কহিল, 'আমার কেউ নেই বলেই তো তোমাদের সঙ্গে আমি খেলতে আসি। আমাকেই তোমরা খেলায় নাও না কেন।'

'বেশ, বেশ, তবে তুমিই হবে আমাদের কমাণ্ডার, অজিতদা, আই-এন্‌-এর কমাণ্ডার-ইন্‌-চীফ্‌', বলিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাদল তাহার উচ্চ পদটি অজিতদাকে ছাড়িয়া দিল এবং এক পায়ের জুতার সঙ্গে অন্য পায়ের জুতা ঠুকিয়া সশব্দ অভিবাদন জানাইল।

অসীমা সামান্য দূরে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে-ছিল, এইবার আগাইয়া আসিয়া কহিল, 'এইবার তোমরা যাও। সন্ধ্যা হয়ে আসচে; হল-ঘরে গিয়ে রেডিয়ো শোন। এক্ষুনি

গল্প-দাত্নর আসর বসবে। একটু পরে আমরাও যাচ্চি। কিন্তু তোমরা যদি চেঁচামেচি দুষ্টুমি করো, তবে ইনি এখান থেকেই চলে যাবেন।...'

'কেউ আমরা চেঁচামেচি দুষ্টুমি করব না, দিদি।' বাদল আশ্বাস দিয়া কহিল এবং যাহাদের হইয়া সে এই আশ্বাস দান করিল তাহাদের দিকে ফিরিয়া মিলিটারি কায়দায় হুকুম করিল ঃ 'রাইট্ অ্যাবাউট্ টার্ণ; কুইক্ মার্চ্চ।'

অপস্রিয়মান বালক আই-এন্-এর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অজিত সহাস্যে অসীমাকে কহিল, 'আফ্শোষ হচ্চে, ছেলেবেলায় কেন এমন ইস্কুলে পড়তে পারিনি। তবে একটা লাভও হয়েচে। জানালা দিয়ে তাকালেই এমন দৃশ্য চোখে পড়লে বইয়েতে আর মন বসত না। কী চমৎকার দৃশ্য! রবীন্দ্রনাথ যে ইস্কুলের ভয়ে আঁৎকে উঠতেন. আপনার এ ইস্কুল তেমন ইস্কুল নয়।' বলিয়া এইবার অজিত সশব্দেই হাসিয়া উঠিল।

অসীমাও স্মিতমুখে কহিল, 'কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীরা আমাকে কেমন ভয় করে, দেখচেন তো?'

'শুধুই কি ওরা!' অজিত অসীমার পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমার চকোলেট-বিতরণ ধরে' ফেলেচেন দেখে আমি নিজে পর্য্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু যেই বুঝতে পারলাম, এ সে প্রকৃতির নয়, অমনি এক মুহূর্ত্তে সব ভয় দূর হলো। আমার মতো, আপনার স্কুলের ছেলেমেয়েরাও এ-কথা নিশ্চিত টের পেয়ে গিয়েচে। তাই ভয় ওরা করে, কিন্তু ভয় পায় না...আপনি ওদের খুব ভালোবাসেন, তাই না?'

'চলুন, এবার ও-বাড়িতে যাই।' অসীমা ইহার জবাব না দিয়া কহিল। 'বেশি দেরি করলে আবার হয়তো সব গুটিগুটি এখানে এসে হাজির হবে।...হয়তো আপনি ঠিকই বলেচেন। এদের আমি যথেষ্ট কঠিন হয়ে শাসন করতে পারিনে; কিন্তু এ তো আমাদের ঠিক ইস্কুল নয়, এ আমাদের বাড়ি। যে পরিবারে অনেক ছেলেপুলে আছে, সেই রকম একটা পরিবার। এর ইতিহাস যদি আপনি জানতেন।...'

'আমি জানি। আমি সব শুনেচি।' অজিত সশ্রদ্ধ কণ্ঠে কহিল।

সাত

দার্জ্জিলিঙের 'সীজন' জমিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন রেলে, বাস্-এ ও ট্যাক্সিতে নতুন নতুন স্বাস্থ্য ও ফ্যাশানলোভী আসিয়া হাজির হইয়া দার্জ্জিলিঙ সহর পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হোটেলে জায়গা নাই; রাস্তায় গা ঘেঁষাঘেঁষি না করিয়া হাঁটিবার উপায় নাই; চৌরাস্তার সরকারী আড্ডাখানার বেঞ্চিগুলিতে স্থানাভাব। বাংলা দেশ ও বাহির-বিশ্ব হইতে বহু এবং বিচিত্র নরনারী দার্জ্জিলিঙের রঙ্গমঞ্চে জীবনলীলা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন। এই লীলা যেমন কৌতূহলপূর্ণ, তেমনি ব্যাপক; অথচ ছোট্ট একটা স্টেজের উপর দিয়া বহিয়া যায় বলিয়া অতি সহজেই ইহার বৈচিত্র্যের সবটাই কৌতূহলী চোখে ধরা পড়িয়া থাকে।

টেনিস্-উৎসাহীরা জিম্খানা ক্লাবে হিমালয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ্-এ খেলোয়াড় অথবা দর্শক হিসাবে যোগ দিয়াছে; জুয়াড়ীরা লেবং-এর ঘোড়দৌড় লইয়া ব্যস্ত আছে; বেকার অথবা চাকরিতে উন্নতিকামীরা 'লোক' ধরিবার চেষ্টায় আছে; বাঙালি কুল-ললনারা সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইয়া ঘোড়ায় চড়িবার বাসনা চরিতার্থ করিতেছে; সাজুনী মেয়েরা সগর্ব্বে সাধারণ্যে ফ্যাশান দেখাইয়া বেড়াইতেছে, আনাড়ী ক্যামেরাধারীরা স্ন্যাপ্শট্ হানিয়া সর্ব্বসহিষ্ণু পাহাড় এবং পাহাড়ীদের পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ভঙ্গ করিবার উপক্রম করিয়াছে। সকলের উপরে আছে অবিবাহিতা মেয়েদের আধুনিকা মায়েরা। কন্যাদের বর-সংগ্রহের চেষ্টায় ইহারা পাহাড় উলোট-পালোট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

শমিতা চৌধুরি তাহার মায়ের তত্ত্বাবধানেই দার্জ্জিলিঙ্ আসিয়াছিল। বর-শিকারের এই চেষ্টা যতই অপমানজনক বোধ হউক, মায়ের দূর-দর্শিতাকে সে অস্বীকার করিতে পারে নাই! কলিকাতার তীব্র প্রতি-যোগিতা, এবং ধূলা-ধোঁয়া ও জনতার ব্যাঘাত হইতে দূরে লক্ষ্য-সন্ধান যে অনেক সহজ এবং কার্য্যকরী হইবে, ইহা সে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু মা এবং মেয়ের সকল গণনাই বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয়ের একমাত্র লক্ষ্য স্বুবর্ণ-মৃগটি দার্জ্জিলিঙের অরণ্যভূমিতে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্দ্ধান করিতেছে। যতই তার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াও, ততই সে আরও দূরে ছুটিয়া পালায়, আরও দুর্লভ হইয়া ওঠে।

'প্লিভা'র চায়ের টেবিলে কলিকাতার বিখ্যাত বনেদী মুস্তফি পরি-বারের অকিঞ্চন অবতংস নন্দ মুস্তফির মুখোমুখি বসিয়া শমিতা বিরক্তি-ভরা মুখে জানালা দিয়া একবার কম্যার্শ্যাল রো'র রঙিন জনতার দিকে ও পরক্ষণে নিজের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। এটা চায়ের সময় নয়। বেলা এখন পৌনে এগারোটা। কিন্তু সাড়ে দশটায় যাহাকে আসিতে বলিয়াছিল সে যদি এখনও আসিয়া না পৌঁছায়, তবে কি বুঝিতে হইবে?

শমিতা হালের সুন্দরী মেয়ে। এক শাড়ি বজায় রাখিয়া যতটা ফিরিঙ্গি সাজা যায়, তাহার সবটাই সে আয়ত্ত করিয়াছে। তাহার সকল আচার-আচরণই অতিশয় ব্যয়-সাপেক্ষ। কেশ-চর্য্যা, নখ-চর্য্যা হইতে শুরু করিয়া রেসে যাওয়া পর্য্যন্ত সকল রকম ব্যসনেই সে অভ্যস্ত। তাহার স্বল্প-ব্রীফশালী ব্যারিস্টার পিতা এই সকল অপরিহার্য্য ব্যয়-ভার বহন করিতে ন্যুব্জ হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে

তিনি তাহার প্রতিবাদও করিতে পারেন না। শমিতার মা ইহাকে উপযুক্ত ইন্‌ভেস্টমেণ্ট বলিয়া গণ্য করেন। মেয়েকে ভাল স্টাইলে রাখিলে তার ভালো বিয়ে হয়, ইহাই তার বিশ্বাস। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শমিতার একটা শাঁসালো বর জুটিতেছে না। আই, সি. এস্ হইতে শমিতার মা ইন্‌কামট্যাক্স্ অফিসারে নামিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন সুরাহা হইতেছিল না। এদিকে মেয়ের বয়স বাড়িতেছে; তারুণ্যের জৌলুষে কবে ভাঁটা লাগিবে, কে বলিতে পারে। ইহা ছাড়া, নানা বাজে বখা ছেলে চারিদিকে আসিয়া জুটিযাছে। কোন্‌দিন ইহাদের কাহার সাথে প্রেমে পড়িয়া মেয়ে অদূরদর্শিতার চরম পরিচয় দিয়া সকল ইন্‌ভেস্টমেণ্ট ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহারই বা ঠিক কি? এমন সময় স্বর্ণমৃগেব সন্ধান মিলিল।

শমিতার মা কান খাড়া করিলেন, উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বুড়া শিকারী যেমন শৌখিন বড়লোকের ব্যাঘ্র-শিকারে সহায়তা করে, তেমনি তিনি কন্যাকে সজাগ ও যত্নশীল করিয়া বর-সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করিলেন। এই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই এইবার দার্জিলিঙে আসা হইয়াছে। শেষ অঙ্কে যবনিকা টানিবার জন্যই এই অভিযান।

'একবার দেখলে অজিতের কাণ্ডখানা!' শমিতা নন্দর দিকে না চাহিয়াই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল। 'এত করে' বলে এলুম, তা তার গায়েই লাগল না! সেধেছি বলে ভেবেচে গরজ আমার...'

'বেচারির আর দোষ কি!' নন্দ তার টাই-হীন শার্টের দুই কান মলিয়া হাঁই তুলিয়া কহিল। 'যে রকম ভাবে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা শুরু করেচ, তাতে যে-কোনও লোকই বিগ্‌ড়ে যেতো! জগতের রীতিই এই। নইলে আমার ওপরই বা তুমি এতটা নারাজ হবে কেন! একটা

আন্‌কোরা খ্যাতিমান তরুণকে ছেড়ে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ডের দিকে নজর দেবে কেন ?'

'থামো, তোমার ফক্কুড়ি ভালো লাগে না।' শমিতা চোখের দৃষ্টি বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া কহিল। 'আমার বয়ে গেছে, গরজ দেখাতে। কিন্তু বার্চ হিলের পিক্‌নিকের ব্যবস্থার ভারটা যে তোমরা আমার কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েচ! এখন সব্বার দুয়ারে দুয়ারে খোসামোদ না করে' বেড়ালে আমার চলবে কেন ?'

'শোন, শমি,' নন্দ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, 'তোমাকে একটা সং-পরামর্শ দিই। টাকার কাছে হৃদয় বিকিয়ো না। তুচ্ছ টাকার কি দাম! আমার পিতৃপুরুষদেরও টাকা কিছু কম ছিল না, কিন্তু তা আজ কোথায় ? ভালোবাসাই হচ্ছে বড়ো কথা। এই ভালোবাসাই সবচেয়ে···'

'থামো। ও সব কথা তোমার কবিতায় লিখো, বিক্রি-না-হওয়া বইয়ের পাতা কেটে পোকারা সুখী হবে!' শমিতা অসন্তুষ্ট কণ্ঠে কহিল। 'কেন তুমি সকাল হতেই পিছে এসে জুটলে! মা এসে দেখলেই চটে যাবেন···'

নন্দ দমিল না, এমন কি, অসন্তুষ্টও হইল না। দীর্ঘ নিশ্বাসের অভিনয় করিয়া কহিল, 'হায় ভাগ্য! রাত-জেগে এত যে কবিতা লিখলুম, মায়ের ক্যাস্‌বাক্স ভেঙে দার্জ্জিলিঙে আসার খরচ সংগ্রহ করলুম, পাহাড়ের চড়াইয়ের পথে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে মারাত্মকভাবে জখম করে' তোমার পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্চি, তাতেও তুমি খুসি হলে না! এইবার তবে আমাকে অর্থ-উপার্জ্জনের দিকেই মন দিতে হচ্চে দেখচি। সকল মূল্যের সার স্বর্ণ মহাধন!···অন্তত আর কিছুদিন

আমাকে সময় দাও, শমিতা দেবী। আমি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করে' তোমার পদতলে উপঢৌকন এনে দেব…'

'তোমার রঙ্গ রাখো। আমার ভালো লাগচে না। তুমি টাকা উপার্জ্জন করবে, তবেই হয়েচে। তাই যদি করবে, তবে কেন আমার এই দুর্দ্দশা? তুমি কাব্য লিখে শুনিয়েচ, তার চেয়ে যদি জর্জ্জেটের শাড়ি উপহার দিতে, ঢের বেশি সুখী হতুম। তুমি গদগদ ভাষায় প্রেম-নিবেদন করেচ। তার জায়গায় যদি ব্যাঙ্কের পাশ্ বইয়ের অঙ্ক দেখাতে, ঢের বেশি মুগ্ধ হতুম। কাব্যের রস পান করে বাঁচা যায় না, তা বোঝবার যার ক্ষমতা নেই…'

'খুব ক্ষমতা আছে,' নন্দ কহিল। 'কিন্তু এত বড় বনেদী বংশের ছেলে হয়ে তুচ্ছ ব্যবসার দিকে মন দিতে ঘৃণা হয়েচে। অন্যের চাকরি নেওয়ার কথা ভাবতে লজ্জা হয়েচে। বাকি রইল কি? কলা! আর্ট! তাই করেচি। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গেই তা করেছি। কোনও অনুতাপ বোধ করিনি। আজ হঠাৎ প্রত্যাখ্যান আমাকে সজাগ করে' তুলল। বিনা টাকায় নারী-চিত্ত জয় করা অসম্ভব! তাই স্থির করেচি, পাকা সিদ্ধান্ত করে' ফেলেচি, অনেক অজস্র টাকা আমাকে উপার্জ্জন করতে হবে…'

'কি করে? টাকার গাছে নাড়া দিয়ে?' শমিতা সব্যঙ্গে কহিল।

'হ্যাঁ, তাই।' নন্দ অবিকৃত মুখে নাটুকে ভঙ্গিতে কহিল, 'ভেবেচি, পলিটিক্স্ করব। দা লাস্ট্ রিজর্ট অব ফুলস্। আমার প্রপিতামহের নাম নিশ্চয়ই জানো। কত বড় স্বদেশী-নেতা ছিলেন তিনি। তার অতি-প্রপৌত্র যদি বিস্মৃতির ধুলা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এক মুহূর্ত্তে সে জনসাধারণ এবং পত্রিকা-সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে…'•

'তারপর ?' শমিতা প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিল।

'আমার চেষ্টা হবে,' নন্দ কোনও দিকে না চাহিয়া কহিল, 'একাগ্র চেষ্টা হবে, শ্রমিক-মালিক বিরোধের সালিশীতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা...'

'তাতে কি হবে ?'

'দু-পক্ষেরই প্রতি অপক্ষপাত আচরণে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে। বনেদী বংশের ছেলে, আজে-বাজে ব্যবসাতে লিপ্ত হয়ে কিছুতেই আভিজাত্য নষ্ট করতে পারি না। রাজনীতি সমাজনীতি পর্য্যন্ত নামতে পারি।...কিন্তু ঐ যা, তোমার মাতৃদেবীর মুখটি সিঁড়ির গহ্বরে দেখা যাচ্চে: তার কাছে এই ব্যবসাটির কথা গোপন রাখতে হবে।...হ্যাঁ, তারপর বার্চ্চ হিলের পিক্‌নিকের জন্য আর কি কি খাওয়ার নিচ্ছ ? অজিতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে' খাদ্যের তালিকাটা ঠিক করাই আমি উচিত মনে করি—চমৎকার ছেলে এই অজিতবাবু!—এই যে মাসিমা, আসুন। পিক্‌নিকের ব্যবস্থা পাকা করবার আগে শমিতাকে অজিত-বাবুর সঙ্গে একবার ভালো করে' আলোচনা করে' নেওয়ার পরামর্শ দিলুম। আমার আবার একবার স্যানিটোরিয়ম্ ঘুরে যেতে হবে। বেলা প্রায় এগারোটা। আমি আর দেরি করব না। অজিতবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় তো...' বলিয়া শমিতার দিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নন্দ দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং শমিতার মায়ের জন্য সাড়ম্বরে একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নিচতলায় নামিবার সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল।

পলায়মান নন্দ মুস্তফির দিকে একবার তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শমিতার মা সৌদামিনী দেবী প্রতিবাদের ভঙ্গিতে নন্দের আগাইয়া দেওয়া চেয়ারটিতেই বসিয়া পড়িলেন। অননুমোদনের স্বরে

কন্যাকে কহিলেন, 'আবার তুমি এটার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করচ! নিজের হিত যদি নিজে না বোঝো, জোর করে কে বোঝাতে পারে...'

'বাঃ রে, আমি কি করব,' শমিতাও প্রতিবাদের স্বরে জানাইল। 'আমি তো এখানে অজিতের অপেক্ষায়ই বসে আছি। কেউ যদি আপনা থেকে এসে এখানে জুটে যায়, আমি কি করতে পারি?'

'অজিত কোথায়?'

'জানিনে।'

'কখন সে আসচে?'

'তাও জানিনে।'

'তার মানে?' সৌদামিনীও অসন্তুষ্ট স্বরে কহিলেন, 'তবে কার জন্য তুমি এখানে বসে আছ!'

'সে মোটেই আসবে কিনা, এ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। আমিই তাকে অনুরোধ করে' এসেছিলাম সাড়ে দশটায় এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে।' রঞ্জিত নখর খুঁটিতে খুঁটিতে শমিতা কহিল।

সৌদামিনী উদ্বিগ্ন হইয়া নিজের হাত-ঘড়িতে সময় দেখিলেন। তাহার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ পরিস্ফুট হইল। 'তবে আর সে এসেচে!' প্রায় স্বগতোক্তি হিসাবেই তিনি কহিলেন। 'এতক্ষণে গিয়ে ডাঃ সেনের অরুণাচলে হাজির হয়েচে। কে জানে, কি দেখেচে সে ডাঃ সেনের ঐ ধুম্‌সি নাতনীটার মধ্যে। যেমন চেহারা, তেমনি সজ্জা-সাজ, মাস্টারনি মাস্টারনি চলন-চালন। আমি তো বুঝতে পারিনে, তুমি নিজে অবহেলা না করলে অমন ছেলে কি করে' এমন অদ্ভুত আচরণ করতে পারে? এমন একটা সুযোগ পেয়েও যদি...'

'যথেষ্ট হয়েচে! দোষ আমার বৈকি। সব দোষই আমার,' শমিতা ফোঁস্ করিয়া উঠিল। 'তোমার কথায় এমন কোন্ ক্যাংলাপনা আছে, যা করিনি; এমন কোন ঢং আছে যা দেখাইনি? এমন কোন্ গরজ আছে যে জানাইনি? সমাজে ছেলেরাই মেয়েদের খাতির দেখায়, তুমি আমাকে উল্টোটা করতে বাধ্য করেচ। অজিত যাচ্চে পুরীতে, আমি ছুটচি পেছনে; অজিত যে ক্লাবের সভাপতি, ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, আমাকে তার সেক্রেটারি পদের জন্য দাঁড়াতে হবে। চায়ের নিমন্ত্রণ, খাওয়ার নিমন্ত্রণ, থিয়েটারে যাওয়ার, মোটরে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণে বেচারী অস্থির হয়ে উঠেচে, তবু তুমি তাকে রেহাই দিতে দাওনি। অজিত পরিচিতের জনতা এড়াবার জন্য দার্জ্জিলিঙ ছুটে এসেচে; অমনি আমরা ছুটে এলাম তার পেছনে। সকল মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে তাকে অনুসরণ করে' বেড়াচ্চি। সমাজে ছেলেরাই মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে; তোমার পীড়াপীড়িতে তার কাছে আমাকেই সে প্রস্তাব করতে হয়েচে। অথচ যেই তোমার হিসেবে গোলমাল শুরু হয়েচে, অমনি বেমালুম সব দোষ আমার কাঁধে চাপিয়ে দিলে। যেন ইচ্ছে করেই তাকে আমি বিগ্‌ড়ে দিয়েচি।...যথেষ্ট হয়েচে, আর নয়। যার ব্যাঙ্কে যত লক্ষ টাকাই থাক, যত সম্পত্তি, যত আয় থাক, আর আমি নিজেকে ছোট করতে পারব না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি দার্জ্জিলিঙে থাক, আমি কাল কি পরশুই এই পোড়ার পাহাড় ছেড়ে...'

'ঐ দেখ!' সৌদামিনী সন্ত্রস্ত হইয়া বিপন্ন কণ্ঠে কহিলেন, 'একটুতেই মেয়ের অভিমান আরম্ভ হলো! এসব আর কার জন্য করচি, বল্? তুই ভালো থাকবি, সুখে থাকবি, এই জন্যই তো

এত। নইলে এই বুড়ো বয়সে আমিই বা এমন করব কেন? আমারই কি সম্মান-বোধ নেই। কিন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় জানি, টাকা না থাকলে কিছু নেই; সংসারের সকল সুখ টাকা থেকেই আসে। তোর বাপের হাতে পড়ে এই মোটা কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেচি। টাকার অভাবে তোর যেন কোনও সাধ অপূর্ণ না থাকে, এজন্যই তো এত চেষ্টা। নইলে কুমুদ চৌধুরি অজিতকে প্রথম যেদিন চায়ে নিয়ে এলেন, সেদিন দোজবর শুনে মন তো কিছুতেই সায় দেয় নি। তারপর যখন রায়বাহাদুর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব বুঝিয়ে বল্লেন…অথচ কাকেই বা জগতে বিশ্বাস করি! চৌরাস্তায় এইমাত্র শুনে এলাম, এই কুমুদ চৌধুরিই নাকি অজিতকে নিয়ে গিয়ে ঐ ধুমসি মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েচে। আর যেই না চেনা করে' দেওয়া, ব্যস্, আর যাবে কোথায়? বেহায়া মেয়েটা অক্টোপাসের মতো তাকে আট হাতে আঁকড়ে ধরেচে! আর আমাদের অজিত! সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, সময়-অসময় নেই, ছুট্, ছুট্, ছুট্, যখনই যাবে, তাকে অরুণাচলে দেখতে পাবে! একগণ্ডা লোকের মুখে শুনে এলাম, তারা স্বচক্ষে দুজনকে ঘুম্-এর রাস্তায় বনের মধ্যে ঝর্‌নার তলায় ঘুরে বেড়াতে দেখেচে। এরই মধ্যে নানা জনে নানান্ কথা বলচে…এর পর আমিই বা কি করে নিশ্চিন্ত থাকি বল্? অমন আটপৌরে মেয়ের কাছে আমার মেয়ে হেরে যাবে, এও কি সহ্য হয়! তাই তো তোকে বলচি… উঃ, ঘোড়ার খুরের শব্দে কথা বলে কথা শোনে কার সাধ্য! ঘোড়-সৈন্য যাচ্চে নাকি, এ যে অনেকগুলি ঘোড়া বলে মনে হচ্চে!…' বলিয়া সৌদামিনী জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া রাস্তার দিকে চাহিলেন।

পাখির বাসা

'দেখ, দেখ একবার কাণ্ড!' বলিয়া সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তিনি শমিতাকে বাহিরে তাকাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। 'একবার চেয়ে দেখ! একপাল ছেলেমেয়েকে ঘোড়ায় চাপিয়ে কে তাদের আগে আগে কদম ছুটিয়ে চলেচে! ঈস্, এ যে ধূলোর মুঠির মতো টাকা ওড়ানো! এমন অপব্যয় যে চোখে দেখে সহ্য করতে পারিনে,' বলিয়া সৌদামিনী আহত ক্লিষ্ট করুণ দৃষ্টিতে অশ্বারোহী-দের শোভাযাত্রার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শমিতাও একবার উঁকি দিয়া দেখিল। দেখিল, অরুণাচলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া অজিত অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ শহরের প্রায় সমুদয় ঘোড়া ইহাতে যোগ দিয়াছে। ঘোড়ার খুরে, শিশুর হাসিতে সারাটা রাস্তা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙের সমুদয় জনতা অবাক হইয়া রাস্তার ধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া এই শিশুবাহিনীকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আনন্দের শোভাযাত্রা শুরু হইয়াছে।

আট

'কাল দুপুরে আপনার বাচ্চাদের যদি একবার সেঞ্চুল্ ঘুরিয়ে আনার প্রস্তাব করি, তবে কি তা না-মঞ্জুর করে' দেবেন ?'

'সম্ভবত। প্রস্তাব না করাই দূরদর্শিতা হবে।'

'এমন শাস্তি পাবার মতো কোন্ অপরাধ করেছি ? প্রস্তাব করতে না করতেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান !'

'ছেলেমেয়েদের স্বভাব আপনি বিগ্ড়ে দিচ্ছেন। এর পর আমাদের দারিদ্র্য ওদের অসহ্য মনে হবে !' অসীমা হাল্কা গলায়ই কহিল।

'এইবার আপনি আমাকে লজ্জা দিলেন,' অজিত পথের মধ্যখানে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল। 'এর পর আমার অন্য প্রস্তাবটা ওঠাতেই সাহস হচ্চে না।'

'আরও প্রস্তাব ! আপনার কি প্রস্তাবের শেষ নেই ?'

'কি করে থাকবে বলুন ? অভাব যে অনেক। আশা যে অনেক। আসুন না, খদের ধারে একটু এগিয়ে যাই। অনেক দিন ধরেই প্রস্তাবটা করব, ভাবচি, যথেষ্ট সাহস সংগ্রহ করতে পারচি নে। আমার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষি সুর থেকে যায়, শ্রোতারা একে গুরুত্ব দেয় না। হয়তো এরই জন্য ছেলেদের সঙ্গে আমার বনে ভালো। আসুন, পাথরের এই চাপ্ড়াটাতে পা ঝুলিয়ে একটু বসা যাক্। পৃথিবীকে সারাক্ষণ পদাঘাতে জর্জ্জরিত'

করে' চলেছি, কিছুক্ষণের জন্য না হয় নিষ্কৃতি দিই।…এই ধরুন, আমার 'অরুণাচলে'র ছোট বন্ধুদের আরাম-আমোদের জন্য আমি যদি কিছু,—মানে, আমি যদি একটা স্থায়ী ফণ্ড্ করে দিতে চাই, তবে কি আপনার অনুমতি পাওয়া যাবে না ?…'

অসীমা ইহার কোনও জবাব দিল না, পথের পাশে যেখানে শেওলা-আকীর্ণ প্রকাণ্ড এক পাথরের চাপ্‌ড়া অতিশয় বেপরোয়া ভঙ্গিতে খদের অরণ্যপূর্ণ গহ্বরের দিকে গলা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার নিকটে সরিয়া আসিল, এবং অকারণে অনাবশ্যক মনোযোগ সহকারে নিচে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

অজিত কাছে আসিয়া কহিল, 'এটাও কি তবে না-মঞ্জুর হলো ? অতি অশুভক্ষণে আজ হোটেল থেকে রওনা হয়েছিলাম। এক একদিন এমনি দুর্ভাগ্যের মর্শুম শুরু হয় ; সেদিন যাতেই হাত দিয়েচ, সেটাই ভণ্ডুল হয়েচে। অথচ রোখ্ চেপে যায়, নিবৃত্ত হওয়া চলে না।…'

'এ প্রস্তাব মঞ্জুর না-মঞ্জুরের মালিক আমি নই।' অসীমা গম্ভীর ভাবেই কহিল। 'এ প্রস্তাব দাদুর কাছেই করতে হবে ; গ্রহণ বা বর্জ্জন সম্বন্ধে তিনিই সিদ্ধান্ত করবেন। কিন্তু…'

'কিন্তু কি ?'

'কেন এসব করচেন ? বড়লোকের দয়া গ্রহণ করে' ইস্কুল চালাতে আমি সর্ব্বদাই সঙ্কোচ বোধ করি।…'

অজিত যেন এক নীরব তিরস্কারে দৃষ্টি পূর্ণ করিয়া অসীমার দিকে তাকাইল। তারপর সহজ, কিন্তু সামান্য ক্লিষ্ট-স্বরে কহিল, 'আজ আপনি আমার ওপর খুব চটে আছেন। দুপুরে অনাবশ্যক অনেক সময় আপনার নষ্ট করেচি। তারপর চা খেয়েও বিদায়

হলুম না, জোরাজুরি করে টেনে নিয়ে এলুম বেড়াতে। বেশ বুঝি, আমার জুলুম বাড়াবাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু নিজেকে সংশোধন করতে, পারিনে। আমার মধ্যে হঠাৎ একটা আস্ত পাহাড়ী ঝরনা উদ্দাম লাফালাফি শুরু করে' দিয়েচে। বিশ্বাস করবেন কি, দার্জ্জিলিঙে এসে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আমি প্রথম প্রাণ খুলে হেসেচি, যেদিন আপনার ইস্কুলের বাচ্চারা প্রথম আমাকে ঘিরে কলরব শুরু করেছিল। এক মুহূর্ত্তে যেন সুখের সন্ধান পেয়ে গেলাম। একটা ব্যর্থ স্বপ্ন যেন বাস্তব হয়ে উঠে'···আচ্ছা, অসীমা, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তুমি কি সত্যই আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পার ?···'

অসীমা চমকাইয়া চোখ তুলিল। এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে শান্তকণ্ঠে কহিল, 'হযতো তাই করতে হবে।···'

'না, না, তা তুমি করতে পারবে না। এত বড ব্যর্থতা তোমার কাছ থেকে আমি কিছুতেই নেব না। তুমি তো আমার দুঃখের ইতিহাস সবই শুনেচ। আমার জীবনে প্রতিমা স্বপ্নের মতো এলো, স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর ঠিক একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা পালন করেচি, কিন্তু এক দিনের জন্যও বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাই নি! এ যে কি যাতনা, তুমি বুঝবে না। মৃত্যুর রহস্যলোক থেকে সান্ত্বনার কোনও ভাষা আসে না, কোনও জবাব আসে না। সব দিক থেকে আমার নিজেরও যেন মৃত্যু ঘটেছিল, শুধু প্রেতাত্মার মতো, মৃত্যুর শান্তি থেকে বঞ্চিত থেকেচি। এমন সময় হঠাৎ তোমার দেখা পেলাম। এ যেন একটা সঞ্জীবনী মন্ত্র। এক মুহূর্ত্তে আমি বেঁচে উঠলাম।···পরিপূর্ণভাবে বেঁচে উঠলাম। আমার এই

নতুন জীবনের আয়ুষ্কাল তোমার দয়ার ওপরেই নির্ভর করচে, অসীমা। আমাকে ব্যর্থ করো না। আমাকে বাঁচাও।' বলিয়া অজিত নিজের বড়ো এবং কঠিন হাতে অসীমার দুই সুকোমল হাত গ্রহণ করিল।

অসীমা বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু স্থির কণ্ঠে কহিল, 'এতে বাধা অনেক!'

'কি বাধা, অসীমা?'

'আমার ইস্কুল।'

'ইস্কুল বাধা কেন হবে? এই ইস্কুল আমরা আরও বড়ো করে' তুলব। নতুন বাড়ি তুলব, নতুন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করব, আধুনিকতম শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করব। এখন যে টাকা 'বড় মানুষের' টাকা বলে' তুমি স্পর্শ করতে ঘৃণা করো, তখন তা তোমার নিজের টাকা হবে; তা তোমার যদৃচ্ছ ব্যয় করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার জন্মাবে।'

'কিন্তু বাচ্চাদের ছেড়ে আমি কি দূরে থাকতে পারব?' অসীমা চোখ না তুলিয়া দ্বিধাভরে কহিল।

'বাপ-মা কি ছেলেমেয়েকে স্কুলে রেখে পড়ায় না, অসীমা? মনে করো, আমরাও তাই পড়াচ্চি। স্বাস্থ্যকর আবেষ্টনে আমাদের বাচ্চাদের সুশিক্ষিত করবার জন্য আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেচি, অথচ সারাক্ষণ স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখে এদের দুর্ব্বল করে তুলচি নে।...অসীমা, তোমার দাদুর কাছেও এ প্রস্তাব আমি করেছিলাম। তিনি কি বল্লেন, জানো? তিনি বললেন, "বেশ তো! দিদিমণি যদি এতে রাজি হয়, তবে আমি খুসিই হবো। তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো।"...তাই সাহস করে' তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।...'

'আমি ভেবে এর জবাব দেব।'

'বেশ, দিও। কিন্তু আমার ছুটির মেয়াদ আর মাত্র একটা সপ্তাহ। দেখো, যেন ব্যর্থতা নিয়ে কলকাতায় ফিরতে না হয়। কিছু আমাকে নিয়ে ফিরতে দাও, অসীমা। আমি যে কত অসুখী, তা তুমি ভাবতে পারবে না...'

বিছানায় শুইয়া শুইয়া বিনিদ্র চোখে গভীর রাত পর্য্যন্ত অসীমা সন্ধ্যা বেলার ঘটনাবলী যেন চোখের সমুখ দিয়া বার বার যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইল। মাত্র দিন পনেরোর পরিচয়ে তাহার জীবনে ভূমিকম্প ঘটিয়া গিয়াছে। অজিতের সারল্য, উহার শিশু-প্রীতি, উহার বালকোচিত উৎসাহ অসীমার চিত্তের স্থবিরতায় নাড়া দিয়া যেন একটা অকাল-বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ টানিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। শঙ্কিত হইয়াই একদিন অসীমা আবিষ্কার করে যে, একটা অদ্ভুত মাধুর্য্য, অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনায় মনটা ভরিয়া উঠিয়াছে, শিরা-উপশিরা ভরিয়া উঠিয়াছে। এমন আশ্চর্য্য অনুভূতি তাহার জীবনে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই।

এই সর্ব্বনাশা ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতিকার হিসাবে সে কয়দিন অজিতের সঙ্গ পর্য্যন্ত এড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু অজিত নাছোড়বান্দা লোক। ছেলে মেয়েদের লইয়া সে যে রকম মাতামাতি শুরু করিল তাহাতে অসীমার নির্লিপ্ত হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। উহাকে বাধা দেওয়াই একটা কাজ হইয়া উঠিল। আর এমন মুস্কিল হইয়াছে, উহাকে আঘাত করিতেও মন ওঠে না, শিশুদের হতাশ করিতেও ইচ্ছা হয় না।

এমন সময় বিরাগ-প্রদর্শনের একটা সঙ্গত কারণ দেখা দিল। কুমুদ চৌধুরি মশায় একদিন অসীমাকে আড়ালে ডাকিয়া তার স্বভাবসিদ্ধ

উপদেশের ভাষায় কহিলেন, 'শোন্, দিদি, একটা কথা বলি। অজিতের সঙ্গে তোর আমরা বিয়ে দিতে চাই। এ-কথাটা তোর দাদু তোকে বলতে সঙ্কোচ করচে। সে বলে, "অজিতের এক স্ত্রী মারা গেছে ; কি করে' দিদিমণিকে আমি দোজবরে বিয়ে করতে বলি ?"—কিন্তু এর কি কিছু মানে হয় ? বল্, দিদি, তুই-ই বল্, এমন ছেলে ক'টা দেখেছিস্ ? জীবনের শুরুতেই বেচারি মস্ত আঘাত পেয়েচে। এত বড়ো আঘাত পেয়েছে যে, সংসারে থেকেও বিরাগী হয়ে উঠেচে। এমন ছেলেকে সুখী-সার্থক করে' তোলা ধর্ম্মের কাজ, উদারতার কাজ।…আমি তাকে এখনও কিছু বলিনি। তুই যদি মা রাজি হোস্, তবে তাকে আমি বলি! আমার তো মনে হয়, এইবার তাকে আমি রাজি করাতে পারব। বল্, মা, লজ্জা কি ? এতে তুই সুখী হবি, এ আমি প্রায় নিশ্চয় করেই বলতে পারি। তা ছাড়া, ইস্কুলের কথাটাও ভেবে দেখতে হয়, মা। মহেন্দ্রের এত সাধের, এত যত্নের ইস্কুলটা যাতে টাকার অভাবে বন্ধ না হয়ে যায়…'

টাকা! তবে টাকার জন্যই তাকে বিবাহ করিতে হইবে! অসীমা ইহাকে আপত্তির এক প্রচণ্ড অজুহাত জ্ঞান করিয়া ক'দিন নিজেকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিল। ছেলেমেয়েদের কড়াভাবে অজিতের দান গ্রহণ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু এখানেও বেশি দিন অনমনীয় হইয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। একে তো অজিত কোনও কিছুতেই অপমানিত বা আহত হয় না, তার উপর আবার স্বপক্ষে তর্ক করিতে আসে। আর শুধুই কি তাই। সে বলেঃ 'দেশের লোক যখন চালের চড়া দাম দিতে না পেরে হাজারে হাজারে রাস্তার ধারে পড়ে' মরেচে, তখন মিলিটারি কনট্রাক্টরের দৌলতে আমার ব্যাঙ্কের বইয়ের অঙ্কগুলি ক্রমেই বেশি ফেঁপে উঠেচে। ফাঁকি দিয়ে পাওয়া ছাড়া এ আর কি ? এ টাকার মায়া

আমি কখনই করিনি। আর এতো শুধু মায়া অ- মায়ার প্রশ্ন নয়। এই অভিশপ্ত টাকা বিলোতে না পারলে যে, স্বস্থই বোধ করতে পারব না। একটু শান্তি যদি পেতে চাই, কেন তাতে বাধা দেন? কেন এমন করেন?'

এ-রকম লোকের উপর কঠিন হইয়া থাকা কি সম্ভব? অসীমাকেও দ্রব হইতে হইয়াছে। এমন সময়, বিনা নোটিশে পূর্ব্ব হইতে সামান্যমাত্র সাবধান না করিয়া অজিত নিজেই সরাসরি তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল। বলিল, তাহার বিগত জীবনের কথা, জীবনের নির্ম্মম ট্র্যাজিডির করুণ ইতিহাস, বলিয়া একান্ত দুঃখীজনের মতো অসীমার করুণা ভিক্ষা করিয়া বসিল। অসীমা এখন ইহার কি জবাব দেয়?

'দিদি!'

'কি রে, ময়না?' চিন্তার মধ্যে হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিয়া অসীমা বুকের কাছে শোওয়া ময়নাকে অভয় দেওয়ার সুরে কহিল। 'কি হয়েচে? জাগ্‌লি কেন? ঘুমো...'

'ভয় করে দিদি।'

'উঃ, কি মেয়ে বাবা!' বলিয়া অসীমা ভীত শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তার নিজের যদি একটি সন্তান থাকিত, তবে এমনি করিয়াই সে তাকে জড়াইয়া শুইত। এর চাইতেও কি মিষ্টি লাগিত তাহাকে? বুকটা কি এর চাইতেও বেশি জুড়াইয়া যাইত?

একটা সপ্তাহের মাত্র মেয়াদ! এরই মধ্যে অজিতকে জবাব দিতে হইবে।

নয়

বেলা এগারটা। রায়বাহাদুর কুমুদ চৌধুরি চৌরাস্তার অব্‌জারভেটরি পাহাড়ের দিকের শেষ বেঞ্চিটিতে একক বসিয়া রৌদ্র-স্নান করিতেছেন। কলিকাতা হইতে খবরের কাগজ আসিয়া পৌঁছিলে এখানে বসিয়াই হেড্-লাইনগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া তবে উঠিবেন। দার্জ্জিলিঙের বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর হইতে ইহা তাহার নিত্য অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম ক'দিন বাঁদর-টুপি সঙ্গে রাখিতেন, এখন তাহাও বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

ভোরের দিকে চৌরাস্তার বেঞ্চগুলিতে ভিড় কম থাকে। এই সময়েই জনতার স্বাস্থ্যার্জ্জনের দিকে বেশি ঝোঁক থাকে বলিয়া আড্ডা-খানায় স্থানাভাব তত প্রবল হয় না।

কুমুদ চৌধুরি অনেকক্ষণ ধরিয়া এখানে বসিয়া আছেন। বার্দ্ধক্যের অজুহাতে তিনি হাঁটেন চলেন কম। ম্যাল্ ধরিয়া অব্‌জারভেটরি হিলের চারদিকে দু'একবার চক্কর দিয়াই চৌরাস্তার বেঞ্চি আশ্রয় করেন এবং যে-কোনও পরিচিত দেখিলেই কাছে ডাকিয়া গল্প ফাঁদিতে চেষ্টা করেন। এক কিস্তি লোক উঠিয়া বেড়াইতে যায়, নতুন কিস্তি সংগ্রহ হয়। দার্জ্জিলিঙের নিরাপদ দূরত্ব এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য হইতে কুমুদ চৌধুরি তাহার পরিচিত এবং অর্দ্ধ-পরিচিতদের কাছে দেশের অর্থ-নৈতিক, সমাজনীতিক এবং রাষ্ট্রিক সকল জটিল সমস্যার আশ্চর্য্য সহজ সমাধান করিয়া দেন। ফলে যাহাদেরই কিছু করিবার আছে, যাহারাই

স্বাস্থ্যার্জ্জনে আসিয়া বৃথা বসিয়া সময় অপব্যয়ে অনিচ্ছুক তাহারাই তাহার নৈকট্য এড়াইয়া চলে। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। কাহারও টিকির ডগা দেখা গেলেই তিনি চেঁচাইয়া উঠিয়া তাহার পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন।

এমন গপ্‌পে লোক সৌদামিনী দেবীকে বারবার সমুখ দিয়া যাতাযাত করিতে দেখিয়াও বহুক্ষণ না-দেখার ভান করিয়া রহিয়াছেন। কাছের লোকের সাথে এমন গল্প জুড়িয়া ব্যাপৃত থাকিবার অভিনয় করিয়াছেন যে, কার সাধ্য অভিযোগ করিবে যে, তিনি চেনা লোককেও চিনিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সৌদামিনী মাত্র কয়েক গজ দূর দিয়া অতিশয় গজেন্দ্র-গমনে বারম্বার গবর্ণমেণ্ট হাউসের দিকে আগাইয়া গেলেন, এবং গোটা অবজারভেটরি পাহাড়টা ঘুরিয়া আসিবার দুশ্চেষ্টা না করিয়া অবিলম্বেই বারম্বার ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন! কুমুদ চৌধুরি বুঝিলেন, তিনিই সৌদামিনী দেবীর লক্ষ্য; কিন্তু দেবী নিজে যাচিয়া কথা কহিতে ইচ্ছুক নহেন।

'এই যে মিসেস্ চৌধুরি, কোথায় বেড়াতে চল্লেন?' অবশেষে রায়বাহাদুর করুণাপরবশ হইয়া কহিলেন।

'কে! রায়বাহাদুর!' সৌদামিনী দেবী এমন বিস্ময়-বিড়জিত কণ্ঠে নিখুঁতভাবে চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন যে, কার সাধ্য বলে, তিনি এক সেকেণ্ড পূর্ব্বেও রায়বাহাদুরের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু জানিতেন।

'আসুন, একটু গল্প করা যাক্।' কুমুদ চৌধুরি মনে মনে প্রচুর কৌতুক-বোধ করিয়া তাহার স্বভাব-সুলভ হৃদ্যতার সঙ্গেই গল্প করিবার আমন্ত্রণ জানাইলেন।

সৌদামিনীকে দুইবার আহ্বান করিতে হইল না। সাহ্লাদে এবং

সাগ্রহেই রায়বাহাদুরের কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, 'বেশিক্ষণ বসতে পারব না। ঢের কাজ পড়ে রয়েচে।'

'কাজ তো পড়ে থাকবেই,' কুমুদ চৌধুরি সায় দিয়া কহিলেন। 'তারপর আর খবর কি বলুন? কেমন লাগচে?'

'ভালো নয়। আর খবর যা, তাতো সব আপনাদেরই কাছে।' সৌদামিনী দূরের দোকানগুলির শো-কেসের দিকে চাহিয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে কহিলেন। 'আমরা সব শুনেই খুসি!'

'কেমন, কেমন?'

'শুনতে পাচ্চি, ঘটকালিতে সম্প্রতি খুব সাফল্যলাভ করচেন। দুবছরের চেষ্টায় যা পারেন নি, এবার সামান্য মাত্র চেষ্টায়ই নাকি সেখানে সফলতা পাওয়া গেছে। আশ্চর্য্য বলতে হবে। কিন্তু কাজটা কি খুব ভালো হচ্চে?'

'কোন্‌টার কথা বলচেন?' রায়বাহাদুর অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিলেন। 'দু-পাঁচ দিনেই সাফল্য লাভ করেচি! মনে করতে পারচি নে তো!'

'মনে ঠিকই করতে পারচেন, কবুল করতে পারচেন না।' মিসেস চৌধুরি তিক্ততার সঙ্গে কহিলেন। 'কিন্তু অজিতের সঙ্গে এ-মেয়ে মানাবে কিনা, তা কি একবার ভেবে দেখেচেন? রুচিতে, ফ্যাশনে চলন-চালনে এমন আধুনিক ছেলে, তার সঙ্গে সেকেলে মাস্টারনি-মেয়ের বিয়ে দিলে সে বিয়ে কি সুখের হবে? তারা না হয় টাকার সন্ধান পেয়ে ছেঁকে ধরেচে। কিন্তু আপনারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। আপনি তো অজিতদের পরিবারের বন্ধু মানুষ। ছেলেটা অমন্ত এবারে যাতে সুখী হতে পারে, তা কি আপনার দেখা উচিত

নয়? ওঁর মাকে একবার জিজ্ঞেস না করে' বিয়ে পাকা করবার আপনার অধিকারই বা কি?'

'বিয়ে পাকা হয়ে গেছে নাকি! আমি তো জানি নে!' এইবার কুমুদ চৌধুরি নিজেও একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন। 'কে বললে আপনাকে? ইদিকে আমি তো ভেবে মরচি, কি করে কথাটা পাকা করা যায়। আপনি কার কাছে শুনলেন?'

'কার কাছে শুনলাম! সারা দার্জ্জিলিঙে এ-কথা কার আর জানতে বাকি আছে?'

'তবে আজকালের মধ্যেই একবার আমাকে অরুণাচলে যেতে হচ্চে দেখচি। মহেন্দ্রকে একবার কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে। গুজবে আমার বিশ্বেস নেই।...ক'দিন ওদিকে যাইনি। এর মধ্যে কি ঘটেচে, বলতে পারিনে। দুচার দিনের মধ্যেই আপনাকে একটা সঠিক খবর দিতে পারব বলে' আশা করি।'

'তা পারবেন, তবে সঠিক খবরের জন্য দুচার দিন আমি অপেক্ষা করতে পারব বলে মনে হচ্চে না।'

'কেন? কি হচ্চে?'

'কালই আমরা দার্জ্জিলিঙ ছাড়ছি।'

'হঠাৎ? এত তাড়াতাড়ি? দু'তিন হপ্তা আছেন বলেছিলেন না?'

'দার্জ্জিলিঙের এই ভিড়ের চাপ সহ্য করার চাইতে কলকাতার গরম হাওয়া ঢের ভালো।'

'এটা মন্দ বলেন নি। তাছাড়া কলকাতার গরম এৎদিনে নিশ্চয়ই কমে এসেচে। সীজনটা এবারে তেমন জমলই না, কি বলেন?...

আরে, ওকে? শমিতা মা নয় তো? রাণী দুর্গাবতীর মতো ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসচে!'

সৌদামিনী রায়বাহাদুরের দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া অদূরবর্ত্তী অশ্বারোহিনীর দিকে তাকাইলেন। শমিতা মাই বটে! তাহার সঙ্গে অপর অশ্বিনী-তনয়ের পৃষ্ঠে রাজপুত রাজপুত্রের আঁট পায়জামা শেরোয়ানিতে সজ্জিত নন্দ মুস্তফি। সৌদামিনীর বিস্ফারিত চোখে ভ্রূকুটি জাগ্রত হইল। অজিতের জঘন্য ব্যবহারে মেয়েটার আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসাবে সে যে নন্দের সাথে অন্তরঙ্গতা বাড়াইবে, ইহা কিছুতেই অনুমোদন করা চলে না!

'হ্যালো, মাম্‌মী; তুমি এখানে!' শমিতা মাকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়ার রাশ টানিয়া কাছে আগাইয়া আসিল, এবং ব্রিচেস্‌-পরা বাঁ-ঠ্যাংটা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া ডান দিকে সরাইয়া আনিয়া অবলীলা-ক্রমে ঘোড়ার পিঠ হইতে নিচে নামিল। কহিল, 'তুমি তো বললে, বেলা বারোটা অবধি মিসেস্‌ মজুমদারের বাড়িতে তুমি আট্‌কা থাকবে! এই তোমার তাঁর ওখানে যাওয়া!...কেমন আছেন, কাকাবাবু?'

'তা ভালোই আছি, মা। তোমরা শুন্‌লাম কালই নেমে যাচ্ছ?' রায়বাহাদুর কুমুদ চৌধুরি কহিলেন।

'দেখুন তো একবার কাণ্ড! কিছুর মধ্যে কিছু নয়, হঠাৎ মা ঠিক করে' ফেল্লেন, আমরা নেমে যাচ্চি। যদি এরই মধ্যেই নেমে যাব তবে এত হাঙ্গামা করে আসার কি দরকার ছিল!' শমিতা মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল।

'যা বোঝোনা, তা নিয়ে তর্ক ক'রো না, শমি।' সৌদামিনী গম্ভীরভাবে কহিলেন।

'তারপর নন্দ, তোমার খবর কি বলো? কুমুদ চৌধুরি কিঞ্চিৎ পেছনে অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া থাকা নন্দ মুস্তফিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। 'ঘোড়ায় চড়ে তোমরা কোথায় বেড়িয়ে এলে?...'

'আজ্ঞে আমি নিমন্ত্রণে বেরিয়েছিলাম,' নন্দ সৌদামিনীকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতে দেখিয়া সভয়ে কহিল। 'শমিতার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এইমাত্র দেখা হলো। মানে একসঙ্গে আমরা মোটেই বেড়াইনি।...'

'নিমন্ত্রণ! নিমন্ত্রণ কিসের হে?'

'আজ্ঞে, আজ বিকেলে আমি একটা মিটিঙে বক্তৃতা দিচ্চি। পাছে শোনবার লোক কেউ না আসে, সেজন্য সতর্কতা হিসেবে প্রত্যেক পরিচিত লোককেই নিমন্ত্রণ করে' এসেচি। আপনিও যাবেন। টাউন-হলে বক্তৃতা হচ্চে। চা-মজুরদের দুর্দ্দশা সম্পর্কে। দুর্গত সহায়ক সভার উদ্যোগে সভা হচ্চে, আর আমিই হচ্চি প্রধান বক্তা।'

'প্রধান বক্তা!' রায়বাহাদুর ঢোক গিলিয়া কহিলেন। 'তুমি আগে কখনও বক্তৃতা করেছ নাকি?'

'আরম্ভ করতে দোষ কি! জলেতে না নামলে কি কখনও সাঁতার শেখা যায়। আপনার ভাবনা নেই। বক্তৃতাটা আগাগোড়া আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। দারুণ ঘাবড়ালেও ভুলে যাব না। এজন্যই তো সাহস করে' স্থানীয় সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করতে পেরেচি। একবার দেখবেন, কলকাতার খবরের কাগজে এই বক্তৃতার কেমন তারিফ্‌ হয়!'

'কিন্তু চা-মজুর সম্বন্ধে তুমি কি জানো হে!' রায়বাহাদুর সবিস্ময়ে

কহিলেন। 'তুমি কি কখনও এদের বা কোনও মজুরের সঙ্গে মিশেচ যে, তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার…'

'ভুলে যান কেন, রায়বাহাদুর,' নন্দ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'আমি একজন কবি। কবির সহানুভূতি দিয়ে আমি রাজকন্যা থেকে আরম্ভ করে রাজমিস্ত্রী পর্য্যন্ত এমন কেউ নেই যার দুঃখের খবর টের না পাই। আজ ভোরে চা খেতে খেতে চা'কে তো আমার কুলির রক্ত বলে' মনে হলো! দু'কাপের পর আর তিন কাপ খেতে পারলাম না…'

'বেশ, বেশ!' রায়বাহাদুর কহিলেন। 'আরও কিছুদিন আছো?'

'কালই কলকাতায় ফিরছি, তবে…'

'কালই কলকাতায় ফিরচ!' সৌদামিনী স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন। 'তুই তো আমাকে তা আগে জানাস্ নি, শমি!'

'বাঃ রে, আজকে ভোরেই রিজার্ভেশন জোগাড় হলো যে। আগে আমি জানতাম নাকি।' শমিতা অসন্তুষ্ট কণ্ঠে কহিল।

'কিন্তু ক'দিন পরেই আবার আমি ফিরে আসচি।' নন্দ কুমুদবাবুর দিকে চাহিয়া ঘোষণা করিল। 'আমার বক্তৃতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাগানে বাগানে চা-মজুরদের যে ধর্মঘট শুরু হবে, তা পরিচালনা করবার জন্যই আমাকে আসতে হবে। লেবার-লীডারগিরির প্রথম পরীক্ষা এদের উপরেই চালাতে চাই। বড় সরল এরা। যা বলব, তাই অকপটে বিশ্বাস করবে।'

'শমি, আমাদের কালকে যাওয়া হচ্চে না, আমরা পরশু যাচ্চি।' সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'তুমি ঘোড়া ছেড়ে দাও। এসো আমার সঙ্গে মিসেস্ মজুমদারের ওখানে। নমস্কার, রায়বাহাদুর। এবার চলি…'

'আসুন,' রায়বাহাদুর কপালে হাত ঠেকাইয়া কহিলেন। 'মজুমদারের ছেলেটি চমৎকার! এইবার একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে যায়, তবেই বেশ হয়। বিলেতে থেকে এসে কে আর না দু'চারমাস বসে থাকে। যমন ধরাধরি করচে, হয়ে যাবে...'

দশ

খবরটা বাদলের ইণ্টেলিজেন্স অফিসার গণুই প্রথম সংগ্রহ করিয়াছিল নানীর কাছ হইতে। অবিলম্বে তাহা শিশু আই, এন্, এ-র হাই-কমাণ্ডের গোচরীভূত হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের চাঁইয়েদের কাছেও ইহা ক্রমে প্রকাশ করা হইল। জাতীয় সংকটে প্রতিপক্ষকেও সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করিতে হয়। ব্যাপারটার গুরুত্বে সকলেই চমকিত হইল। নেতাদের মধ্যে গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিস্‌ফাস্ চলিতে লাগিল। নানী খবর দিয়াছে, শীঘ্রই অজিতদার সঙ্গে দিদির বিয়ে হইবে! বিয়ে হইলে দিদি কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না!

এত বড় বিপদের পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। মিনিট পনেরো পূর্ব্বে নানীর হেপাজতে শুইবার জন্য তাহারা উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল; নানী বিদায় হওয়া মাত্র শিশু-রাজ্যের নেতারা পা টিপিয়া টিপিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া আসিল, এবং ইতর-সাধারণকে বারবার নৈঃশব্দ্যের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়া ছেলেদের ডর্মিটরির মেঝেতে আনিয়া জড়ো করিল। সেইখানে বাদল চাপা কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ গলায় সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিস্থিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইল।

নন্তু কহিল, 'ভারি চালাক অজিতদা'টা! চকোলেট-লজেঞ্চুষ খাইয়ে, ঘোড়ায় চড়িয়ে, মোটরে চড়িয়ে আমাদের ভুলিয়ে এখন আমাদের দিদিকেই নিয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে!'

ডলী মাস্টারি গলায় কহিল, 'অন্যেরটা কেন খেতে যাও! খেতে গেলে অমনিই হয়...'

ইনু বলিল, 'বাঃ রে, খেলুমই বা, তাতে কি? তা বলে, আমাদের আমাদের দিদিকে নিয়ে যাবে কেন?'

ময়না কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল, 'না যাবে না। দিদি যাবে না। না...'

শিবু বলিল, 'নাকীস্বরে কাঁদবি না ময়না। খুব তো অজিতদাকে তখন ভালো বলতে, এখন কেমন? অজিতদাটা ভারি পাজি...'

ময়না কহিল, 'না, অজিতদা পাজি নয়। অজিতদা খুব ভালো। কত বেড়িয়ে আনে, কতো চকোলেট দেয়...'

'চুপ কর, লোভী মেয়ে।' কানু ধমক দিয়া উঠিল। 'চকোলেট খেয়ে ভুলে গেছ! ওসব দিয়েই তো ওরা লোক ভোলায়। বাইরে দেখে মনে হবে, খুবই ভালো, অথচ ভেতরে ভেতরে তোমার সব্বনাশটি করচে। খবরের কাগজে এদের কি বলে জানিস্?'

'কি বলে?' গণু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

'এই বিদ্যে নিয়ে আবার আই, এন্, এ, করচিস। আমার কাছ থেকে দু'বচ্ছর শিখে যাস্। এদের বলে, ফিফ্‌থ্ কলাম! ঘরের শত্রু বিভীষণ!'

'ফিফ্‌থ্ কলাম!' 'ফিফ্‌থ্ কলাম!' 'অজিতদা ফিফ্‌থ্ কলাম!' বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ইহার এমন সুউচ্চ সমর্থন আসিল যে, খাটের বাজুর উপরিস্থিত সভাপতির উচ্চাসন হইতে বাদলকে ধম্‌কাইয়া সাবধান করিতে হইল, 'চুপ, চুপ। এত জোরে নয়। এক্ষুনি তবে দিদি এসে হাজির হবে। সভা বের করে' দেবে। আমরা আই, এন্, এ। আমরা

কথায় নেই, আমরা কাজ চাই। দিদিকে আমরা যেতে দেব না। কেন যেতে দেব। দিদি আমাদের দিদি। অজিতদার সে কে? আমরা অজিতদাকে বয়কট করব। খবরদার, আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলবে না; কেউ তার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না। সে কিছু দিতে এলে মুখ বেঁকিয়ে...'

'ওতে হবে না, ওতে হবে না,' কানু বাধা দিয়া কহিল। 'এই তুমি আই, এন্, এ-র সর্দ্দার! ওতে কি হবে! ঢিল ছুঁড়তে পার? পারলে তবে কাজ হবে! জোরে ঢিল ছুঁড়তে হবে। ঢিলের ভয়ে আর সে এদিকেই এগুবে না...'

বাদল কহিল, 'ধ্যেৎ, ভদ্রলোককে বুঝি কেউ ঢিল মারে!'

কানু কহিল, 'ঈস্, কি আমার ভদ্রলোক রে! চুরি করে সে যে দিদিকে নিয়ে যেতে চায়, তার কি? তুই ভয় পাস্ তো আমিই ঢিল ছুঁড়ব। বড় আমার আই, এন্, এ-র সেনাপতি! ঢিল ছুঁড়তেই ভয়ে মরিস...'

ময়না প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'বাঃ রে, ঢিল ছুঁড়লে অজিতদার কেটে যাবে যে। লাগবে যে। বাঃ রে!'

কানু ধমক দিয়া কহিল, 'চুপ কর, শাঁকচুন্নী। লাগবে! লাগবে তো আমাদের কি?...কেমন বাদল, সাহস আছে?...'

গণু কহিল, 'হ্যাঁ, ঢিল ছোঁড়, আর অজিতদার চোখে মুখে লেগে যাক্! তখন দিদি এসে যে কান মলে লাল করে' দেবে!'

কানু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করিয়া কহিল, 'ওঃ, এই তোদের সাহস! জখম না করেই শত্রু তাড়াবি! ছোঃ! বেশ, তবে না হয় আর এক কাজ কর। অজিতদা কাল এলে চুপে চুপে ওপর থেকে তার গায়ে ঠাণ্ডা

জল ঢেলে দে। পরপর ক'দিন জামা-কাপড় ভিজতে থাকলে তখন মজাটা টের পাবে। আর এদিকে পা বাড়াবে না। দিদি যদি ধরে ফেলে, অমনি বলবি, বাইরে জল ফেলতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ গায়ে পড়ে গেছে। এটা পারবি তো, না এতেও ভয়ে জুজু হবি?'

'ঠিক, ঠিক, ঠিক!' একসঙ্গে বহুলোক হাততালি দিয়া উঠিল।

নন্তু ধমক দিয়া কহিল, 'চুপ, এত জোরে নয়। দিদি শুনতে পাবে।'

কানু বেশ জোর গলায় কহিল, 'কি বাদল, এটা পারবে, না এটাও আমাকেই করতে হবে?'

বাদল কহিল, 'পারব না মানে? খুব পারব। আমরা আই, এন্, এ-রা সব পারি। কিন্তু ও কি? সিঁড়িতে কিসের শব্দ! সেরেছে। সভা ডিস্‌মিস্। দিদি! দিদি!...'

গণু ছুটিয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, তাই। দিদি! দিদি!'

পলকে পার্লামেণ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পরিত্যক্ত বিছানাগুলি আবার তাহাদের মালিকদের দ্বারা অধিকৃত হইল। দু-একটি নাক এমন জোরে ডাকিয়া উঠিল যে, একমাত্র নাকের স্বত্বাধিকারীরা ছাড়া তাহা যে প্রকৃত ঘুমের লক্ষণ নহে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবার কথা নহে। বাদলকে ছুটিয়া আসিয়া শব্দায়মান নাসিকাগুলির উপর সজোর থাবড়া মারিয়া এই নাকডাকা বন্ধ করিতে হইল।

অসীমা উপরে উঠিয়া দেখিল, সব কিছুই একেবারে চুপচাপ ও শান্ত। শিশুদের কোথাও কেহ যে জাগিয়া আছে, তাহার সামান্যতম লক্ষণ আবিষ্কার করা গেল না। মনে মনে হাসিয়া সে প্রকাশ্যে কহিল, 'সব একদম চুপচাপ দেখতে পাচ্ছি। অথচ একটু আগেই ওপর থেকে

অনেক হাততালি শোনা গিয়েচে। অথচ এরই মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়ল দেখচি। আচ্ছা, বেশ, দেখি সবাই কেমন ঘুমিয়েচে।' বলিয়া সে সহাস্যমুখে ময়নার খাটের কাছে আগাইয়া গেল।

'ময়না যদি ডান পা নাড়ে।' অসীমা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিল, 'তবেই বুঝব, সে ঘুমিয়েচে। দেখি এখন, কেমন সে পা নাড়ে।'

মুহূর্ত্তকাল দেরি হইল না। ময়নার ডান পা যেন মন্ত্রে নড়িয়া উঠিল। পা নাড়িয়া সে প্রমাণ করিয়া দিল, সে মোটেই জাগিয়া নাই।

অতিকষ্টে অসীমা হাসি চাপিল। মুচ্‌কি হাসিয়া যেন দেওয়ালকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'বাঃ, সত্যিই দেখি ময়না আজ ঘুমিয়ে পড়েচে। আজকে আর তবে ওর ভয় করবে না। আজ আমি একাই শুতে যাই।'

'দিদি!' প্রতিবাদের জরুরি কণ্ঠ।

'কি রে! তুই ঘুমুসনি? সে কি!'

'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছিলাম। তোমার কথা শুনে ঘুম ভেঙে গেল, দিদি।' ময়না আবেদনের স্বরে কহিল।

'দুষ্টু মেয়ে। আয়।' প্রথামত ময়নাকে কোলে তুলিয়া অসীমা নিজের শোবার ঘরের দিকে আগাইয়া আসিল।

অজিত বলে: 'বাপ মায়ের কাছ হতে দূরে থেকে ছেলেমেয়েরা কি পড়ে না?' কথাটা সত্য। বাড়ির বাইরে যে নিয়মানুবর্ত্তিতা শেখা সম্ভব, বাড়িতে আপনার লোকের কাছে বাস করিলে তা সম্ভব হয় না। ছেলেরা আব্দারে বা মর্জ্জিবাজ হইয়া ওঠে। অসীমার কাছ

হইতে দূরে থাকিয়া আধুনিক পন্থায় শিক্ষিত হইতে পারিলে পরিণামে শিশুদের হয়তো মঙ্গলই হইবে, কিন্তু অসীমা কি ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিবে? যারা তার জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া অচ্ছেন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাদের কি দূরে রাখা সম্ভব? বুদ্ধি দিয়া যা গ্রাহ্য মনে হয়, হৃদয় তাতেও যে সায় দিতে চায় না!

ময়নাকে কোলে লইয়া অসীমা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ঘুমন্ত পাহাড় ও অরণ্যের দিকে চাহিয়া পর্দামুক্ত কাচের বড়ো জানালাটার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার পট-পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। নতুন পরিবেশে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সে পারিবে কি? অসীমার যেন ভয় করিতেছে।

'ও কি রে, অত জোরে আঁকড়ে ধরছিস কেন?' অসীমা অবাক হইয়া আশ্লেষপরায়ণ ময়নার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া কহিল। 'এ কি হচ্চে?'

'তুমি আমাকে ফেলে যেও না, দিদি। ফেলে যেও না।'

'কোথায় যাব! আমি তো শুতেই এসেচি। চল্, তোকে শুইয়ে দিই।' বলিয়া অসীমা জানালা ত্যাগ করিয়া শয্যার দিকে আগাইয়া গেল।

এগারো

লাঞ্চের পর তুটো ঘণ্টা অজিতের যেন আর কাটিতে চায় না। বই পড়িতে যায়, বইয়েতে মন বসে না; আরাম কেদারায় শুইয়া একটু চোখ বুজিয়া লইতে চায়, মনের চাঞ্চল্য স্থির থাকিতে দেয় না। হৃদয়ের রাজ্যে যেন অতি বেপরোয়া মাতামাতি শুরু হইয়াছে। মরু-ভূমির পথিক অন্তহীন উষরতার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে যেন মরূ-দ্যানের সন্ধান পাইয়াছে; এখনও লক্ষ্যে পৌঁছাইতে দেরি আছে, কিন্তু উল্লাসে স্নায়ুমণ্ডলী আর শৃঙ্খলা মানিতে চাহিতেছে না। দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ের তরঙ্গ, টাট্টু ঘোড়া, অপরিচ্ছন্ন লেপ্‌চা রিক্সা-চালক, নেপালী কুলি-রমণী সব কিছুই যেন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে যে আর কখনও এমন উন্মাদনা সম্ভব হইবে, ইহা সে বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু তাহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পরপ্রান্ত হইতে তুর্য্যোগান্তের কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো উজ্জ্বল রঙিন মূর্ত্তিতে অসীমা হৃদয়ের সীমান্তে কল্পনাতীত আকর্ষণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কাঙাল যেমন তাহার ধন এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড়াল করিতে ভরসা পায় না, অজিতও অসীমা সম্পর্কে সেই ভীরু আশঙ্কায় সারাক্ষণ কণ্টকিত হইয়া থাকে। ডাঃ সেন যদি তাকে হোটেল ত্যাগ করিয়া 'অরুণাচলে'র যে কোনও রকম আরাম-আয়োজন-বিবর্জ্জিত কুঠরিতে আসিয়া থাকিবার আমন্ত্রণ করিতেন, তবে সে বোধ হয় বিনা দ্বিধায়ই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিত।

এমন সময় ঘড়িতে দেখা গেল, বেলা চারটে বাজিয়া কোন না দু'তিন মিনিট আগাইয়া গেছে। নিশ্চয়ই এবার অসীমার ইস্কুল ছুটি হইয়াছে। মিষ্টি ছেলেমেয়েগুলি এবার কোলাহল করিতে করিতে ক্লাস-কাম্‌রার বাহিরে আসিয়া খাওয়ার ঘরের দিকে ছুটিয়াছে; লম্বা টেবিলটার একপ্রান্তে বসিয়াছেন ডাঃ সেন আর অপর প্রান্তে অসীমা নিজে। নানী একে একে শিশুদের গ্লাসগুলি অসীমার কাছে ধরিলে অসীমা প্রত্যেকের পাত্রে নিজের হাতে গরম দুধ ঢালিয়া দিতেছে। রুটিতে আগে হইতেই মাখন মাখানো আছে; এইবার ক্ষুধার্ত্ত শিশুরা মহাপরিতৃপ্তি সহকারে রুটি চিবাইতে শুরু করিবে!

ক'দিন এই বৈকালিক জলযোগের আগেই অজিত উপস্থিত হইত। নানা রকম মিষ্টি ও ফল উপহার লইয়া যাইত। নিজেও এই দলে বসিয়া পড়িত। কিন্তু অসীমার নীরবতা সত্ত্বেও অল্প দিনের মধ্যেই সে টের পাইল, অসীমা ব্যাপারটা যথেষ্ট অনুমোদন করিতেছে না। এই বিরাগের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এইবার অজিত নিজেও তাহার উপহার-দানের বিসদৃশতা টের পাইল। উহাদের সাদাসিধা আহার্য্যের মধ্যে দামি এবং রকমারি খাবার লইয়া গেলে উহাদের আহার্য্যের অতি-সাধারণত্বের প্রতিই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়! বাচ্চাদের ভালো ভালো জিনিষ খাওয়াইবার লোভ তার যতই হোক, অসীমার অসন্তুষ্ট চাহনির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পর অজিত দমিয়া গেল। আর সে চায়ের টেবিলে হাজির হয় না; শিশুদের উপহার দিবার পন্থা সে বদ্‌লাইয়া ফেলিল। এখন চায়ের অন্তত আধ ঘণ্টা পরে সে হাজির হয়, এবং নিতান্ত খেলাচ্ছলে ক্রীড়ারত শিশুদের কাহারও না কাহারও

কাছে সেদিনের উপহার জিম্মা করিয়া দিয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মতো ডাঃ সেনের কাছে যাইয়া গল্প জুড়িয়া দেয়।

হোটেলের নেপালী বয় ট্রেতে বৈকালিক চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া লইয়া আসিয়াছে; তাড়াতাড়ি এক কাপ মাত্র চা ঢালিয়া লইয়া অবশিষ্ট আহার্য্য অজিত বয়কেই দান করিল। পাম্প শু ছাড়িয়া পূরা-দস্তর জুতোতে পা ঢুকাইয়া দিল। ঘরের এক প্রান্তের তেপা-য়াতে প্যাকিং কাগজে মোড়া তিনটি পুষ্ট চেহারার বাণ্ডিল রাখা ছিল; অজিত ইঙ্গিতে বয়কে তাহা কাছে আনিতে আদেশ করিল। আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে চা শেষ করিল। ড্রেসিং-গাউন গা হইতে বিচ্যুত হইয়া খাটের উপরে গিয়া উড়িয়া পড়িল। গলাখোলা শার্টের উপর চড়িল হ্যারিস্ টুইডের কোট। কিন্তু মুস্কিল হইল বাণ্ডিলগুলি লইয়া। একজন লোকের পক্ষে এমন মোটা মোটা তিন তিনটা বাণ্ডিল বাগানো একটা কম বড় সমস্যা নয়।

'মো নি তিম্‌র সঙ্গ্ যাইঙ্ছু সাব্?'

'যাইঙ্ন।' অজিত তাহার দুর্লভ নেপালী ভাষায় করিল।

'রাতি কথি বেলা ফরকিন্‌ছ?' ডিনার ঘরে আনা দরকার হইবে কিনা জানিবার জন্য সাহেবের ফিরিতে কত রাত হইবে এই প্রশ্নটি রোজই বয়কে করিতে হয়। ডিনারের সময়কে সাহেব মোটেই তোয়াক্কা করে না।

'কো নি (কে জানে)!' বলিয়া অজিত তাহার নেপালী ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা সমাপ্ত করিল, এবং বগলে ও হাতে বাণ্ডিল বাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দাঁত বাহির করিয়া আকর্ণ হাস্য করিতে লাগিল বয়। কম

বকৃশিষ সে সাহেবের কাছে পায় না। অথচ মোটে জ্বালাতন করে না। 'ওছেন' বা বিছানা হইতে সাহেবের ড্রেসিং-গাউন উঠাইয়া সে যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল, এবং ট্রে হইতে ক্রিম-পূর্ণ একটা পেস্ট্রি উঠাইয়া সানন্দে মুখে পুরিয়া সে বিছানা ঝাড়িতে আরম্ভ করিল।

তাড়াতাড়ি চায়ের পাট সারিয়া চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া অসীমা মার্কেট স্কোয়ারে সওদা করিতে বাহির হইয়াছিল। 'অরুণাচলে'র বাচ্চারা লন্-এ বৈকালিক মাতামাতি ছুটোছুটি শুরু করিয়াছে। ডাঃ সেন লাইব্রেরি ঘরের জানালার ধারে আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্য্যাস্তের বর্ণবিন্যাস লক্ষ্য করিতেছেন। নানী তাহার গোল গোল চোখ তুটি সতর্কতায় ভবিয়া 'বাবা'দের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছে; বিপজ্জনক আচরণ লক্ষ্য করিলেই হাঁক দিবে।

এমন সময় বগলে ও বুকের উপর তিন তিনটা বাণ্ডিল বাগাইয়া নিচের শড়ক হইতে উপরে উঠিয়া আসিল অজিত। প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লানো সর্ব্বদাই একটু কঠিন হয়। বাচ্চারা একই সঙ্গে সমুদ্রের তুরন্ত ঢেউয়ের মতো গায়ের উপরে আসিয়া সশব্দে ঝাঁপাইয়া পড়ে; কাঁপাইয়া দোলাইয়া, টানিয়া পিষিয়া একেবারে তটস্থ করিয়া আনন্দের রসে দেহ-মন অভিসিঞ্চিত করিয়া তোলে। এই সমুদ্র-স্নানে বয়সের সকল তফাৎ ভাসিয়া যায়।

আজ কিন্তু অজিত সামান্য বিস্মিত বোধ করিল; বহু দূর হইতে সন্ধান পাইবার ক্ষমতা 'অরুণাচলের' শিশুদের এমন চমৎকার যে, নিচের শড়ক হইতে 'অরুণাচলে'র নিজস্ব পথের অর্দ্ধেক আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা টের পাইয়া ফেলে। অকস্মাৎ একটা আবিষ্কার-

সঙ্কেত ধ্বনিত হয় ; একটা কল-গুঞ্জন জাগিয়া ওঠে, হুটোপুটি শুরু হইয়া যায়, মানবকসৃষ্ট এক ঘূর্ণিপাকে আবর্ত্তিত হইতে হইতে অবলীলাক্রমে সে উপরে উঠিয়া আসে। অথচ নিচের পথ অতিক্রম করিয়া আজ সে 'অরুণাচলে'র হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এখনও কেহ তাহা টের নাই।

শিশুদের যে কোনও একজনের সাথে অজিত দৃষ্টি মিলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এক জোড়া চোখও এদিকে ঘুরিতেছে না। খেলায় ইহারা অত্যন্ত মাতিয়া উঠিলেও এমনটা হয় না, অথচ ইহারা যে খেলা লইয়া খুব মাতিয়া আছে, এমনও মনে হইল না।

'বাদল! জেনারেল বাদল!'

কোনও সাড়া নাই। বরঞ্চ মনে হইল, বাদল যেন একবার অপাঙ্গে তাকাইয়া দেখিয়া সাঙ্গ-পাঙ্গদের কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি কহিতেছে।

'ইনু, শিবু, তাতা!'

আহ্বানের কোনও জবাব না দিয়া উপরোক্ত সকলেই পিছন ফিরিয়া সামনের পাহাড়ের গাছপালাজঙ্গল লক্ষ্য করিতে লাগিল।

'ব্যাপার কি? কি দেখচ সবাই? এই দেখো, তোমাদের জন্য আজ কি এসেচে। তিন তিনটা বাণ্ডিলভর্ত্তি ক্রিম-ভরা কেক আর ম্যারাংক্‌স…এই নাও, টুটু…'

'খবরদার! নিস্ নে টুটু!' কানু টুটুর চোখের ঈষৎ প্রলুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া চাপা গলায় দ্রুত সাবধান করিল।

'নেবে না কেন?' অজিত সবিস্ময়ে উভয়ের পানে চাহিল। 'দিদি বকেচে? দাঁড়াও, আমি দিদিকে গিয়ে বলচি। এগুলি ধর দেখি, নন্তু…'

ধরা দূরে থাকুক, নন্তু মিলিটারি কায়দায় মার্চ করিয়া তিন ধাপ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

'বাদল, তোমার আই, এন, এ এ-রকম করচে কেন!' অজিত আরও বিস্মিত হইয়া কহিল। 'তোমরা যে রীতিমত...এই যে ময়নাদিদি! এই বাণ্ডিলটা তোমার সবটাই...'

'এই ময়না, চলে আয়।' কানু গর্জ্জন করিয়া উঠিল। 'হাত বাড়াচ্চেন! হাত ভেঙে দেব না!'

'তোমরা আজ হঠাৎ এমন করচ কেন?' বিব্রত অজিত ঝান্সীর রাণী বাহিনীর বুলুকে একপাশে আবিষ্কার করিয়া কহিল। 'তোমাদের দিদি কোথায়?'

ঝান্সী বাহিনীর বীরাঙ্গনা ইহার কোনও জবাব না দিয়া লেফ্‌ট্‌ অ্যাবাউট্‌ টার্ণ করিলেন।

বাদল হাঁকিল, 'কোম্পানী, ডিস্‌মিস্‌!'

আর কোনও কথা নয়, কোলাহল নয়, প্রতিপক্ষ কানুর কাছ হইতে বাদলের আদেশের সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ নয়, এতগুলি ছেলেমেয়ে নিঃশব্দে গৃহের দিকে মার্চ করিয়া চলিল, অজিতের দিকে তাকাইয়া পর্য্যন্ত দেখিল না। যেন কেহই তাকে চেনে না, কোনও দিন তাকে চোখেও দেখে নাই।

এ এক মহা রহস্য! অজিত বুঝিল, এইরূপ ব্যবহার করিবে বলিয়া ইহারা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিল, কিন্তু ইহার হেতু সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিল না। অসীমা তার এত উপহার দেওয়া পছন্দ করে না; কিন্তু তাই বলিয়া নিজে নিষেধ করিবার পরিবর্ত্তে তার ছাত্রছাত্রীদের এরূপ ব্যবহার করিতে বলিবে, ইহা

অবিশ্বাস্য। তবে এরূপ আচরণের অর্থ কি ? উপহার গ্রহণে বাচ্চারা যে লোলুপতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, হয়তো অসীমা সে জন্য তাহাদের মন্দ বলিয়া থাকিবে ; ফলে ইহারা অভিমান করিয়া বসিয়াছে। শিশুদের বিচারে সে-ই হয়তো অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ঈষৎ ক্ষুণ্ন এবং ঈষৎ কৌতুক বোধ করিয়া অজিত অসীমার সন্ধানে গেল। একমাত্র সে-ই এই রহস্যভেদে সাহায্য করিতে পারে।

'এস বাবা, এস। দিদিমণি একটু বেরিয়েচে। শীগগিরই ফিরবে। তুমি বসো।'

'ভালোই হয়েচে,' অজিত মৃদু হাস্য করিয়া ডাঃ সেনের পাশের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'আপনার সঙ্গে চুপে চুপে একটা কথা সেরে নিই, দাদু। অসীমা উপস্থিত থাকলে এ-প্রসঙ্গ ওঠাতে আমার সঙ্কোচ হয়।'

'কি বলবে, বাবা ?'

'জানেন, দাদু, আপনার কাছে নিজেকে কেবলই যেন অপরাধী বলে মনে হচ্চে। ক'দিন ধরেই এ কথাটা আপনাকে জানাব ভাবচি, কিন্তু সুযোগ হয়নি। কেন অপরাধী মনে হয় জানেন ? অসীমা আপনার কত বড় ভালোবাসার ধন, আমি জানি। আশৈশব আপনি তাকে বুকে করে' লালন করেচেন। বাবা, মা, ঠাকুমা, দাদু সকলের স্নেহ এক সঙ্গে জড়ো করে' তাকে আপনি বড়ো করে' তুলেচেন। তার জন্যই এই আশ্চর্য্য খেলাঘর আপনি তৈরি করেছিলেন।···তারপর কোথা থেকে আমি এসে উদয় হলাম। আমি কোথাকার কে, সামান্য ক'দিনের পরিচয়ে আপনার এত বড় আদরের ধন নিয়ে যাবার বায়না ধরেচি। এই আব্দারের স্পর্দ্ধায় আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই···'

'জগতের এই তো চিরকেলে নিয়ম, বাবা!' অজিতের মুখের উপর একবার ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ডাঃ সেন বলিলেন। 'জগতের প্রত্যেক বাপ-মাকেই বিচ্ছেদের এই বেদনা সইতে হয়। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার আমারই কি উপায় আছে? কিন্তু দিদিমণি সুখী হবে, এইটেই যে সব চেয়ে বড়ো কথা। এর চেয়ে আনন্দও তো আর কিছু হতে পারে না।···সে যেন কোনও দুঃখ না পায়, ব্যথা না পায়, এটি তুমি দেখো, বাবা। তবেই আমি সুখী হবো।'

'দাদু?'

'কি, বাবা?'

'আপনি যদি নাত-জামায়ের সঙ্গে গিয়ে থাকতে রাজি হতেন, তবে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু এই অনুরোধ করা হয়তো আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।'

'তা রাখব বৈকি। তুমি কি আমার পর?'

'যেমন আপনার নাতনীকে আপনার কাছ থেকে আমি কেড়ে নিয়ে যাচ্চি, তেমনি আপনার এই আশ্চর্য্য খেলাঘরের ক্ষতিপূরণ করার ভারটাও আমাকে দিন। আপনার এই অপূর্ব্ব নীড়টিকে আমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে' তুলতে চাই। এই প্রতিষ্ঠানের সকল আর্থিক দায়িত্ব আমার ওপরে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। এতে কিছুতেই আপনি আপত্তি করতে পারবেন না। প্রয়োজনের চেয়ে আমার অনেক বেশি টাকা আছে। আমি এই অনাবশ্যক টাকার একটা সদ্‌গতি চাই। যৌতুক হিসেবে আমি কি এটুকুও দাবি করতে পারিনে?···'

'আশ্চর্য্য তোমার যৌতুকের দাবি!' ডাঃ সেন ক্ষণকাল নীরবে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন। 'এ হলে যে আমি বেঁচে যাই,

বাবা অজিত। এর ভার বইবার ক্ষমতা আর আমার নেই। আমার চেয়ে সবল কাঁধে এর ভার তুলে দিতে না পারলে একদিন সব চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে, এইটেই যে আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেচে। শক্তিমান, সহানুভূতিশীল, আদর্শবাদী কেউ এসে এর ভার আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুক, আমি যে মনে মনে এই প্রার্থনাই করে' এসেচি। কিন্তু এমন ভাবে যে সে-প্রার্থনা পূর্ণ হবে তা তো ভাবতে পারিনি।··· হ্যাঁ, এর দায়িত্ব আমি তোমার আর আমার দিদিমণির হাতে দিয়ে যাব। এ দায়িত্ব তুলে দিতে পারলে আমি মুক্তি পাই···'

'তা পাবেন না, দাদু।' অজিত সহাস্যে কহিল। 'এর আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার আপনার। সে ক্ষমতা আর কারুর নেই। ছোট্ট নাতনীটিকে উপলক্ষ্য করে' একদিন যে মধুর বাসা আপনি তৈরি করেছিলেন, আপনি হাজির না থাকলে তার প্রকৃতিই বদ্‌লে যাবে। এটা পূরাপূরি খেলাঘরই থাকুক, এই তো আমরা চাই, দাদু। স্নেহ, সহানুভূতি ও আনন্দের পরিবেশে শিশুর শিক্ষা কত সহজ হয়ে ওঠে, আপনি নিজের জীবনে তা প্রমাণ করেচেন; এ দায়িত্ব আপনার ছাড়া চলবে না। এর যেটা গন্ধময় দিক, টাকা-কড়ির দিক, মাত্র তার ভারই আমি নিতে পারি···'

'তবে নাও, তাই নাও।' বলিয়া ডাঃ সেন পাশের ড্রয়ার হইতে একটা ব্যবহার-বিবর্ণ ব্যাঙ্কের পাস-বই টানিয়া বাহির করিলেন। ত্রস্ত-কম্পিত আঙুলে কয়টা পাতা উল্টাইয়া হিসাবের শেষ পাতাটি বাহির করিলেন। অঙ্কটার উপর ক্ষণকাল চোখ বুলাইয়া কহিলেন, 'এই আমার সঞ্চয়ের অবশিষ্ট। একত্রিশ হাজার তিনশো একুশ টাকা সাত আনা। অতি কষ্টে দিদিমণির জন্য এই টাকাটা আমি বাঁচিয়ে রেখেচি। দিদিমণির

ভবিষ্যৎ ভেবে শত অভাব সত্ত্বেও এ টাকাটায় হাত দিতে আমার সঙ্কোচ হয়েচে। যখনই এর থেকে ব্যয় করেচি, প্রথম সুযোগেই আবার তা পূরণ করে' রেখেচি। এ আমার কৃপণের ধন। 'অরুণাচলে'র ফণ্ডে তবে এইটুকুও জমা করে নাও, ভাই।'

'নেব বৈকি, নিশ্চয়ই নেব।' বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া অজিত বৃদ্ধের পায়ের ধূলা লইল। 'এ দান যে অমূল্য। এবার তবে আমার প্ল্যানটা আপনাকে শুনতে হবে…'

'বলো,' ডাঃ সেন প্রশান্ত মুখে কহিলেন।

পাহাড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র চূড়া অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়াছে। এ সময়টিতে দার্জ্জিলিঙের জনতার স্রোত চৌরাস্তাভিমুখী প্রবাহিত হয়। 'সীজনে'র মজা জমিয়া ওঠে।

অসীমা যখন 'অরুণাচলে'র হাতায় আসিয়া ঢুকিল তখন পাহাড়ের এখানে ওখানে দুচারটি করিয়া বিজলী বাতি জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। সওদা করার কাজটা যে অসীমা খুব পছন্দ করে, তা নয়। কিন্তু তবু এ কাজটা সর্ব্বদাই সে নিজে করে। তাহার এত যত্নের শিশুরা যত সাধারণ খাওয়াই থাক্, খাদ্যগুলি একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হইলে উহাদের তাহা খাইতে দিতে তার মন সরে না। তাই তাকে নিজেই কেনা-কাটা করিতে হয়।

লন্ হইতে ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা ঘরে গিয়াছে দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। নিয়ম-পালন সম্পর্কে নানী সর্ব্বদাই উহাদের সতর্ক করিয়া দেয় বটে, কিন্তু অসীমা অনুপস্থিত থাকিলে উহারা নানীর অনুরোধ-উপরোধের

প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। বাহির হইতে বাচ্চাদের ভিতরে লইয়া যাওয়া সর্ব্বদাই একটা কঠিন কাজ। আজ কিন্তু সবাই ভারি লক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি গাড়ি-বারান্দার কাছেও কেহ ঘোরাফেরা করিতেছে না!

সহসা বাসা-বাড়ির দোতলার বারান্দার খোলা জানালার দিকে অসীমার নজর পড়িল। বিস্ময়ে তার দুই চোখ পূর্ণ হইল। দেখিল, এই জানালাটা দিয়া বাদল তাহার দেহের উপরার্দ্ধ অতি বিপজ্জনক ভাবে বাহিরে বাহির করিয়া মাথাটা এদিকে ওদিকে বারবার আন্দোলিত করিয়া কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। পলকে অসীমার পায়ের নখ হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সাতঙ্কে অসীমা চিৎকার করিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একটা কাণ্ড ঘটিল। ডান হাতে একটা কাচের 'জগ্' লইয়া বাদল তাহার সকল জল উপুড় করিয়া নিচে ঢালিয়া দিল। মাত্র একবার ত্রস্ত ভীত দৃষ্টিপাতে নিচেটা দেখিয়া লইয়া পলকে মাথাটা সে ভিতরে গলাইয়া লইল।

স্তম্ভিত অসীমা এতক্ষণে একবারও নিচে লক্ষ্য করে নাই। এইবার সে সবিস্ময়ে দ্রুত নিচে তাকাইল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, জানালার ঠিক নিচে, পাথর-ছড়ানো পায়ে-চলা রাস্তার উপর, উপর দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া অজিত দাঁড়াইয়া আছে! চলিতে চলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। জল তাহার গায়ে পড়ে নাই, কিন্তু তাহার আধ হাত মাত্র দূরে রাস্তার শাদা পাথরগুলি ভিজিয়া আছে।

চকিতে ব্যাপারটা অসীমা হৃদয়ঙ্গম করিল। বিস্ময়ের আর তার মাত্রা রহিল না। অজিত ইহাদের সাথে হাসি-পরিহাস করে, সমবয়সীর রীতিতে দৌড়াদৌড়ি করে, খেলা করে। কিন্তু তাই বলিয়া উহারা

তাহার সাথে এ রকমের ইয়ার্কি করিতে পারে, তাহা তাহার কল্পনাতীত। এ রকম শিক্ষা তো অসীমা উহাদের দেয় নাই। ভদ্রতা ও ভদ্র-আচরণ সম্বন্ধে সে সর্ব্বদাই কড়াকড়ি করিয়াছে। তাহার সকল শিক্ষা কি এমন ভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে? দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে, অপমানে অসীমার কাঁদিয়া ফেলিবার অবস্থা হইল। কোনও মতে নিজেকে স্থির রাখিয়া সে অজিতের কাছে আগাইয়া আসিল। কণ্ঠের উপর কঠিন সংযম প্রয়োগ করিয়া সে প্রায় শান্তভাবেই কহিল, 'তুমি কতক্ষণ এসেচ? বসবার ঘরে এসে একটু বসো। আমি ওপর থেকে আসচি। আমি ভাবতে পারি নে, আমার শিক্ষা এদের কাছে এমন ভাবে ব্যর্থ হবে। আমার অতিথিকে এমন ভাবে...'

'না, না, ওদের কিছু বলো না,' অজিত অসীমার মুখের আশঙ্কাজনক প্রশান্তি লক্ষ্য করিয়া সাতঙ্কে কহিল। 'যে কারণেই হোক্, আমার ওপর আজ ওরা খুব চটে উঠেচে। একটি কথা পর্য্যন্ত কেউ আমার সঙ্গে বলেনি। কিন্তু তুমি যদি এ নিযে ওদের শাসন করতে যাও, তবে আমার সঙ্গে ওদের আড়িটা পাকাপাকি হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে আজ আমি যাই। আজ ওরা ঠাণ্ডা হোক। কাল এসেই আমি আবার ভাব করে নেব...'

অসীমা সামনে পা বাড়াইয়া ক্ষণকাল থামিয়া কহিল, 'ওদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে আমারও কিছু কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য পালন না করা আমার পক্ষে মারাত্মক অপরাধ হবে।—চৌকিদার, সাহেবকে হল্-কামরায় নিয়ে বসাও...'

অসীমা আর কিছু বলিল না, আর কোনও দিকে চাহিল না, সিধা হাঁটিয়া দোতলায় যাইবার সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল।

'বাদল !'

এক মুহূর্ত্তে আই, এন, এ-র বীর সেনাপতির মুখমণ্ডল ভয়ে পাংশু হইয়া উঠিল। ধরা-পড়া হত্যাকারীর মতো বিব্রতদৃষ্টিতে সে একবার যেন চারদিকে পলায়নের পথ সন্ধান করিল, কিন্তু তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সহসা চলৎশক্তিহীন হইয়া একবারে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া পড়িল।

'কাছে এসো।' অসীমা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল।

ক্ষণকাল যেন এ আদেশ বাদলের মস্তিষ্কেই প্রবেশ করিল না। তারপর সহসা সে ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া ফাঁসির মঞ্চের যাত্রীর মতো আগাইয়া আসিল।

'কেন এমন করে' ওপর থেকে জল ঢেলে দিলে? জল ফেলবার মানে? জবাব দাও? চুপ করে' থেকো না। ইচ্ছে করে' লোকের গায়ে তুমি জল ঢালবার চেষ্টা করেচ, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কি বলবার আছে, শীগ্‌গির বলো? তোমাকে এর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে। যদি কিছু বলবার থাকে, এই বেলা বলো··'

বাদল কোনই জবাব দিল না, মুখ নিচু করিয়া তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

'এ-সময়ে তুমি ওপরে কেন? এ সময়ে কারুর ওপরে আসা নিষেধ, তা কি তুমি জানো না? বাঁদর কোথাকার! বাঁদরামি করবার আর জায়গা পাও নি। এতোদিন আমি এই শিখিয়েচি? যে মানুষ আদর করে', আব্দার রক্ষা করে', হাজার উপহার এনে তোমাদের খুসি করতে চেয়েচে, তার গায়ে অনায়াসে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে তোমার একটুও আটকালো না? জঙ্গলী ভূত কোথাকার!

বাঁদর! হনুমান!' বলিয়া অসীমা বাদলের কান ধরিয়া সজোরে কয়টা মোচড় দিয়া দিল। 'জবাব দাও, শীগ্গির জবাব দাও...'

কোনও জবাব আসিল না। কোনও জবাব নাই। ক্রোধে, দুঃখে অসীমা নির্ম্মম হইয়া উঠিল। বাদলের দু'কান ধরিয়া সে আরও ঝাঁকাইল। তারপর কড়া করিয়া আদেশ করিল. 'নিল্ ডাউন হয়ে বসে থাকো এখানে। দুই কান ধরে বসো। যতক্ষণ না আমি উঠতে বলি, ততক্ষণ এখান থেকে উঠতে পারবে না। এক পাও নড়তে পারবে না। খবরদার।'

বাদল চাপা কান্নায় ফুলিয়া ফুলিযা উঠিল, কিন্তু একটুও চেঁচাইল না। নীরবে সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। নতমুখে দুটি অলস হাত দুর্ব্বল ভঙ্গিতে উঠাইয়া দুই কানই চাপিয়া ধরিল। পরাজিত হইলেও সেনাপতির মর্য্যাদা সামান্যমাত্র ক্ষুণ্ণ করিল না।

বারো

রাত এখন আটটা। অসীমা বাচ্চাদের খাওয়ার তদারক করিবার জন্য খাওয়ার টেবিলে আসিয়া বসিয়াছে। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে অজিত বিদায় লইলে অসীমা হিসাবের খাতা লইয়া পড়ে, এবং হিসাব শেষ হইলে লাইব্রেরি ঘরে দাদুর কাছে গিয়া বসে। সেখানে দাদুতে নাতিনীতে ইলিয়টের কবিতা লইয়া আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনা বন্ধ হইল নানী আসিয়া 'বাবাদের' রাতের খাবার আনার খবর দিলে।

নানীই প্লেটে প্লেটে গরম স্থপ্ ঢালিয়া দিয়াছে॥ ছোট ছোট আহারার্থীরা আশ্চর্য্য নীরবতার সঙ্গে যথাসাধ্য কম শব্দ করিয়া চামচ চামচ স্থপ্ মুখে পুরিতেছে। অসীমা টেবিলের পুরোভাগে বসিয়া নানীকে মাংসের 'স্ট্' হাজির করিতে বলিল, এবং একটির পর একটি প্লেটে আন্দাজ মতো সব্জি ও মাংস তুলিয়া দিয়া বলিয়া চলিল: 'টুটু! ময়না! ইরা! বাব্লু!...' এবং সেই অনুযায়ী প্লেট বিতরিত হইতে লাগিল। সহসা প্লেটে আহার্য্য ঢালিতে গিয়া অসীমা একবার থামিয়া গেল, এবং প্রায় চম্কাইয়া চাহিয়া দেখিল, বাদলের চেয়ার শূন্য! প্রতিটি শিশুই নীরবে দিদির দৃষ্টি অনুসরণ করিল, যেন তাহারা এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছিল।

ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে শাস্তির আদেশ দিয়া অসীমা নিচে নামিয়া

আসে। প্রথমে তার মনটা তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। শাস্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনও সন্দেহ ছিল না বলিয়া অজিতকে এ প্রসঙ্গ সে উঠাইতে দেয় নাই। তারপর নানা আলোচনা এবং কাজে সন্ধ্যার অপ্রীতিকর ঘটনাটা মন হইতে কখন মুছিয়া গেল, সে টের পাইল না। খাবার টেবিলের শূন্য চেয়ারটা সহসা তাহাকে যেন খোঁচা মারিয়া সজাগ করিয়া তুলিল।

অসীমা কোনও কথা বলিল না, এবং শিশুদের অর্থপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দোতলার সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল। বাদলকে দু'ঘণ্টা ধরিয়া শাস্তি দিবার ইচ্ছা তার ছিল না, কিন্তু অপরাধ করিলে তার শাস্তি পাওয়াই উচিত। বাদল কি এখনও হাঁটু গাড়িয়াই বসিয়া আছে? দু'ঘণ্টা ধরিয়া অমন করিয়া থাকা সহজ কথা নয়। বাদল হয়তো উঠিয়া বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পড়িলেই ভালে। এর জন্য অসীমা নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দিবে না। শাস্তি এদের সে দিতেই চায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে কড়া হইয়া শাসন না করিলে ইহারা যে নিতান্ত বুনো হইয়া উঠিবে! কিন্তু দুই ঘণ্টাও তো কম সময় নয়: এমন করিরা বাদলের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়া কি তার উচিত হইয়াছে?

একটু লজ্জিতভাবেই অসীমা উপরে উঠিয়া আসিল: কোথায় বাদল? জানালা দিয়া তার মাথাটা তো নজরে পড়িতেছে না। যাক্, বাঁচা গেল। নিশ্চয়ই সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। ভালোই হইয়াছে। পুরাপুরি তার হুকুমটা মানিতে গেলে ছেলেটার বড় কষ্ট হইত। দুঘণ্টা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া থাকা কি সোজা কথা? অথচ এত বড় শাস্তি দিয়া অসীমা তাহার কথাটা বেমালুম ভুলিয়াই গিয়াছিল, যেন শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব কম বড় দায়িত্ব!

পাখির বাসা

অসীমা ডর্মিটরিতে ঢুকিয়া অবলীলাক্রমে বাদলের বিছানার দিকে নজর করিল। তাঁহার অনুতপ্ত মন সেখানে বাদলকে দেখিতে পাইলেই যেন খুসি হইত। কিন্তু বাদল সেখানে নাই। অসীমা সভয়ে দৃষ্টি কাছে সরাইয়া আনিল; দেখিল, ঠিক যে জায়গায় বাদল নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া শাস্তি গ্রহণ করিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই মেঝের উপর সে কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্লান্ত দেহটা খাড়া হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াও সে দিদির আদেশ অমান্য করে নাই। মেঝের উপর দুই হাঁটুই আশ্চর্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গাড়িয়া রাখিয়াছে! দুই হাতে দুই কান ধরা। শুধু তার ছোট্ট বুকের দুরন্ত অভিমান নিদ্রার মধ্যেও বার বার প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ফুলিয়া উঠিতেছে।

অসীমার বুকের ভিতরটা পলকে মোচড় দিয়া উঠিল। এই অসহায় শিশু যেন তাহার নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং বাধ্যতা দিয়া অসীমাকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। এমন কচি ছেলের দুটো কান সে অত জোরে মোচড়াইয়াছিল কি করিয়া? ছোট্ট সেনাপতির মর্য্যাদা সে এতখানি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ধূলিসাৎ করিতে পারিল কি করিয়া? শিশুদের শিক্ষা দিবার এই কি উপায়? অপরাধের কারণ জানিবার চেষ্টা না করিয়া শারীরিক শাস্তিদান করিলেই কি শিশুর সংশোধন হয়? শিশুশিক্ষার আধুনিকতম প্রণালী এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের এত জানিয়াও সে এমন পন্থা অবলম্বন করিল কেন? বাদল তো সে রকম ছেলে নয় যে কথা বলিলে শোনে না, ভালো কথা বলিলে বোঝে না! তবে অসীমা এমন করিয়া ক্রোধে সংযম হারাইল কেন?

অনুতপ্ত হৃদয়ে অসীমা আগাইয়া গেল এবং মায়ের মতো স্নেহে

ঘুমন্ত বাদলকে কোলে তুলিয়া লইল। সহসা অসীমা চম্‌কাইয়া উঠিল। এ কি! বাদলের গা যে পুড়িয়া যাইতেছে। বারবার সে বুকে, গলায়, কপালে হাত রাখিয়া দেখিল। কোনই সন্দেহ নাই। এ তাপ সামান্য নহে। সারা গায়ে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে।

অসীমা এক মুহূর্তে পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। ইচ্ছা হইল, নানীকে চিৎকার করিয়া ডাকে। অতি কষ্টে সে নিজেকে সংবরণ করিল! বাদলকে বুকে করিয়া অসীমার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া নিজের বিছানায় শোয়াইয়া দিল। কম্বলটা তাড়াতাড়ি তার গায়ে টানিয়া দিয়া ছুটিয়া গেল ড্রেসিং-টেবিলের কাছে। টানা খুলিয়া থার্মোমিটারটা খুঁজিয়া বাহির করিল। পারা ঝাঁকিয়া বাদলের জিবের তলায় থার্মোমিটার গুঁজিয়া দিয়া অসীমা পাংশু মুখে মণিবন্ধের ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া রহিল।

'চৌকিদার, চৌকিদার!' উপর হইতে সহসা অসীমার কণ্ঠ তীব্র শীতের বাতাসের মতো নিচের ঘরগুলি এবং লন্‌-এর উপর তীক্ষ্ণভাবে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল।

চৌকিদার মানসিং উনানের সান্নিধ্যে আরামে বসিয়া বাবুর্চির সাথে গল্প জুড়িয়াছিল, 'মিসি বাবা'র তীব্র আহ্বান শুনিয়া 'জীউ' বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। দুই হাত আগে আগে দোলাইয়া পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়ার ভঙ্গিতে বাবুর্চিখানা হইতে সে বাংলোর দিকে ছুটিল।

দোতলার ব্যালকনি হইতে অসীমা কহিল, 'উপর আও, চৌকিদার। জল্‌দি আও।'

মানসিং এবারও বলিল, 'জীউ।'

পাখির বাসা

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মানসিং চিঠি হাতে 'অরুণাচলে'র বাঁধা ডাক্তার ঘোষের বাড়ির দিকে 'হুপ্' 'হুপ্' শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

তেরো

রাত দুটো। অসীমার দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতে চায়, কিন্তু মাঝে মাঝেই ঘুমন্ত বাদল যেমন আজেবাজে বকিয়া চলিয়াছে, তাতে অসীমার চোখ বুজিতে ভরসা হইতেছে না। জ্বরটা এখনও প্রায় আগের মতোই প্রবল আছে। ডাঃ ঘোষ পরীক্ষা করিয়া ওষুধ দিয়া গিয়াছেন, এবং আশ্বাস দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া গিয়াছেন, ছেলে-পুলেদের জ্বর যেমন চট্ করিয়া বাড়ে, তেমনি সহসা ছাড়িয়াও যায়! কিন্তু জ্বরের সূত্রপাতে ইহার প্রকার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ভাবে যে কিছু বলা সম্ভব নয়, তাহা অসীমা জানে। ঘুমের ঘোরে বাদল একটু বেশি এলোমেলো বকিতেছে। ইহার বিজড়িত ভাবটাই তার আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, নহিলে ঘুমাইয়া কথা বলার অভ্যাস বাদলের নতুন নয়।

কত জোরে কান মলিয়া দিয়াছিল অসীমা? এত জোরেও লোকে বাচ্চা মানুষকে আঘাত করে? এত ব্যথাও কি একটা ছোট ছেলে সহিতে পারে? কি চণ্ডাল ক্রোধ পাইয়া বসিয়াছিল অসীমাকে! বারবার অপরাধীর মতো অসীমা নিজ মনে কথাগুলি আওড়াইয়া চলিল। তাহার যেন কান্না পাইতে লাগিল। এবার যদি বাদলের অসুখটা কোনও গুরুতর আকার ধারণ করে, তবে সে দায়িত্ব তাহার। নিজেকে তবে অসীমা কোনওমতেই মার্জ্জনা করিতে পারিবে না।

নির্জ্জীব বাদলের শিয়রে বসিয়া অসীমা অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা

করিল। 'আমার অপরাধ হয়েচে, প্রভু। ওকে তুমি ভালো করে দাও। আমার দায়িত্ব আমি উপযুক্ত ভাবে পালন করতে পারিনি; শাস্তি আমারই প্রাপ্য।

অসীমা সন্তর্পণে আবার বাদলের গায়ে হাত দিয়া তাপ পরীক্ষা করিল। এ কি, জ্বর কমিয়াছে নাকি! গা-টা যে অনেক ঠাণ্ডা মনে হইতেছে! প্রার্থনা কি সত্যসত্যই সফল হইয়া উঠিল! উত্তেজনায় অসীমার সারা শরীর কাঁপিয়া উঠিল। নিঃশব্দে বিছানা হইতে উঠিয়া সে থার্মোমিটারটা সংগ্রহ করিল এবং বারবার ঝাঁকিবার পর তাহা ঘুমন্ত বাদলের জিবের তলায় ঢুকাইয়া দিল। নিশ্চয়ই কমিয়াছে জ্বরটা! কতটা কমিয়াছে? অন্তত দু-এক ডিগ্রি যদি কমে, তবেই বা কম কি? একশো চারের নিচে এ পর্য্যন্ত একবারও তো নামে নাই।

সময় উত্তীর্ণ হইলে ধীরে ধীরে থার্মোমিটার টানিয়া লইয়া অসীমা জানালার কাছে আগাইয়া গেল। কিন্তু বারবার ভুরু কুঁচকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াও বাহিরের অস্পষ্ট আলোয় পারদের সূক্ষ্ম রেখা নজরে পড়িল না। অগত্যা অসীমা টর্চ বাহির করিয়া আলো জ্বালিল। দেখিল, জ্বর একশো চারেরও দুই পয়েণ্ট উপরে। অসীমা স্তম্ভিত হইয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরের অস্পষ্ট দৃশ্যাবলীর মতো তার বুদ্ধিও যেন আবছা হইয়া উঠিল।

'আর করব না, দিদি, আর কক্ষনো করব না দিদি। আমি আর অমন কক্ষনো করব না দিদি; এইবার আমাকে ছেড়ে দাও...'

অসীমা চমকাইয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিয়াছে নাকি বাদল? প্রলাপ কি এত স্পষ্ট হয়? এ যে স্পষ্ট বাদল কথা কহিতেছে!

অসীমা দ্রুত বিছানার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ডাকিল, 'বাদল!'

বাদল ইহার কোনও সাড়া দিল না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের মতো বলিয়া উঠিল, 'আমি আর করব না, দিদি, আমি আর অমন করব না। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তুমি আমাদের ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের ফেলে চলে যেয়ো না…'

অসীমা বিব্রতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রলাপ বকিলে কি করিতে হয় সে জানে না। ঠেলিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দেওয়া অপেক্ষা ভুল বকিতে দেওয়াই বোধহয় ঠিক! রোগীর শান্তির ব্যাঘাত করিতে নাই, এটা সে জানে।

'কেন তোমাকে অজিতদা নিয়ে যাবে, দিদি? কেন সে নিয়ে যাবে শুনি? তুমি তো আমাদের দিদি। তুমি তার দিদি নও। তবে কেন সে তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে? বাঃ রে, কেন সে নিয়ে যাবে? নিয়ে গেলে আমরা থাকব কার কাছে? তোমাকে ছেড়ে বুঝি আমরা থাকতে পারব? আমাদের বুঝি কষ্ট হবে না। বাঃ রে, আমাদের বুঝি কষ্ট হবে না! বাঃ রে!…'

এইবার অসীমা প্রলাপের তাৎপর্য্যে বিস্মিত হইল। বলিতেছে কি ছেলেটা? কে ইহাদের নিকট বলিল যে, সে চলিয়া যাইবে? এত কথা যে বাদল জানে, সে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তবে কি সকলেই তাহার গোপন রহস্যের কথা জানে? যে সব শিশুদের না জানাইয়াই অসীমা তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই কি তবে তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন?

'তবে কানু বললে কেন, আগে জল ঢাল্। জল ঢাল্‌লেই পালিয়ে

যাবে। দিদিকে আর নিয়ে যেতে পারবে না। ওরা তো বলেছিল ঢিল মারতে। ঢিল মারলে বুঝি অজিতদার ব্যথা লাগত না? কেটে যেত! তাই তো আমি জল ঢালতে রাজি হলাম। তুমি রেগো না, দিদি। আর কক্ষনো এমন করব না। কিন্তু আমাদের ফেলে তুমি যেয়ো না, দিদি, যেয়ো না। তোমার সব কথা আমি শুনব। খুব ভালো করে পড়ব। গোল করব না। ঝগড়া করব না। চেঁচামেচি করে…' বাদলের কথা ক্রমে অস্পষ্ট ও এলোমেলো হইয়া উঠিল।

অসীমা স্তম্ভিত হইয়া বাদলের শিয়রে বসিয়া পড়িল। কিছু বুঝিতে আর তার বাকি রহিল না। একটা অহেতুক সঙ্কোচে তাহার সমস্ত মন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যেন সে তাহার পরিবারের অগোচরে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। এইবার ইহাদের কাছে তার মুখ দেখাইতেও সঙ্কোচ হইবে। অজিতের সহিত ছেলেমেয়েদের কথা কহিবার অনিচ্ছা হইতে শুরু করিয়া গায়ে জল ঢালিয়া দেওয়া অবধি সকল দুর্বিনীত আচরণের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া উঠিল। অসীমা শঙ্কিত হইয়া বাদলের সুষুপ্ত মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

'দিঁদিঁ!'

'কে!'

চম্‌কাইয়া অসীমা পাশে তাকাইয়া দেখিল, ঢিলা ইজের পরা ময়না আলুথালু চুল-ভরা মাথাটা একদিকে কাৎ করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'তোমার কাছে শোঁব, দিঁদিঁ।'

'উঃ, কি মেয়ে বাবা! এক দিনও কি আমার কাছে না শুলে চলে

না।' অসীমা ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল। 'এখানে শুবি কি রে, বাদলের জ্বর হয়েচে দেখচিস না, হিংসুটে মেয়ে? ··চল্‌, তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি! আজ এখানে শোওয়া নয়, লক্ষ্মী মাণিক।'

মন্দের ভালো হিসাবে ময়না এ প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল, এবং অসীমার কোলে চড়িয়া নিজের বিছানার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

'এদের ফেলে কি আমার যাওয়া সম্ভব?' অসীমার বুকের মধ্য হইতে এই নিঃশব্দ প্রশ্নটা যেন অবলীলাক্রমে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ময়নাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া পাশে বসিয়া তাহার মাথা আঙুল দিয়া আঁচড়াইতে শুরু করিয়া সে কহিল, 'এইবার চট্‌পট্‌ ঘুমো দেখি, ময়না। আজ বেশি আব্দার চলবে না···'

পরদিন সন্ধ্যায় অজিত অন্যান্য দিনের মতো 'অরুণাচলে' হাজির হইলে অসীমা তাকে বাগানের এক প্রান্তে বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের নিচের বেঞ্চটাতে নিয়া বসাইল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। এই জন্যই নিরিবিলিতে নিয়ে এলাম···'

'এমন কি কথা, অসীমা?' অজিত সামান্য বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল। সকৌতুকে কহিল, 'দার্জ্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কলকাতায় তোমার জানালার সামনে নিয়ে বসিযে দেবার জন্য হুকুম করবে না তো?'

'আমাদের বিয়ের প্রস্তাবটা বুঝি ভেঙেই দিতে হয়।' অসীমা বেঞ্চে বসিয়া এবং দৃষ্টি পায়ের তলার ঘাসের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া আশ্চর্য্য স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল।

'সে কি অসীমা! এমন পরিহাসও কেউ করে।' অজিত স্তম্ভিত হইয়া কহিল।

'আমি অনেক ভেবে দেখলাম।' অসীমা মুখ নত রাখিয়াই কহিল। 'ভেবে দেখলাম, বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলিকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়। ওরা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না; হয়তো আমিও পারবনা। কিন্তু আমার পারা না-পারা, লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন ওঠে না। আমার ওপর আমার নিজের চেয়েও ওদের দাবি বড়ো।'

'অসীমা, এরা তো আমাদের রইল,' অজিত কহিল। 'তুমি চলে যাবার পর 'অরুণাচলে'র শিক্ষা ও পরিচর্য্যার যাতে অবনতি না হয় তার জন্য কি কি ব্যবস্থা হয়েচে, তোমাকে এখনও বলিনি, কিন্তু দাদু সবই জানেন। এতে তাঁর পূরো সম্মতি রয়েচে। এদের জন্য কেন তুমি আশঙ্কা করচ? এরা যাতে...'

'তা হয় না', অসীমা স্থির কণ্ঠে কহিল। 'যতো ব্যবস্থাই তোমরা করো, আমাকে ছাড়া ওদের চলবে না। ওরা আমাকে ছাড়বে না। জোর করে আমি ওদের ছেড়ে যাব, এমন সাধ্য আমারও নেই। ছোট হাতে ওদের কত জোর! তোমার পায়ে পড়ি, এদের কাছ থেকে তুমি আমাকে নিয়ে যেয়ো না। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি! খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েচি।...তোমার সঙ্গে না-দেখা হলেই আমার ভালো ছিল। আমি কি করব বলো? বিয়ের পর কি আমার এখানে থাকা চলবে? এমন প্রস্তাব আমিই বা কি করে' করি। এতে নিশ্চয়ই তুমি রাজি হবে না। কেউ রাজি হবে না। দুটোর একটা আমাকে ছাড়তেই হবে...'

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া অসীমার আনত এবং উচ্ছ্বসিত মুখের

দিকে চাহিয়া রহিল। অসীমার কণ্ঠে এবং ভাষায় এমন বিশৃঙ্খলতা সে পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করে নাই। এই বিশৃঙ্খলতা হইতে অসীমার হৃদয়ের পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারার আলোড়ন আঁচ করিয়া লওয়া অসম্ভব হইল না।

নিঃশব্দে কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর অজিত চিন্তিত-মুখে কহিল, 'দুটোর কোনটাই যাতে তোমাকে না-ছাড়তে হয়, তেমন ব্যবস্থায় রাজি হওয়া আমার নিজের পক্ষে হয়তো অসম্ভব নয়। যার একেবারেই কিছু নেই, সামান্য পেলেই সে খুসি হ'তে পারে। দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের চূড়ায় যদি আনন্দের একটা নীড় থাকে, আমার মতো হতভাগ্য লোকের পক্ষে তা কম বড লাভের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি ভাবচি, আমার মা এতে রাজি হতে পারবেন কি ? তাঁর শূন্য বাড়ি আমার স্ত্রী এসে ভরে' তুলবে, এই আশা নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। দীর্ঘকাল তাঁকে আমি হতাশ করেচি। আজ তাঁর সাধ পূর্ণ করে' তোলবার মুখে আবার কি তাঁকে হতাশ করতে হবে ?'

'বেশ, তাঁকে তুমি হতাশ করো না। কিন্তু আমিই বা আমার নিজের সুখের জন্য কি করে' আমার এতোগুলো শিশুকে হতাশ করব ? তা আমি পারব না। এরা তবে দুঃখে মরে' যাবে, এরা আমাকে স্বার্থপর ভাববে।...চলো, এবার ঘরে যাই। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।' বলিয়া অসীমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিতও দাঁড়াইয়া উঠিল। কহিল, 'কলকাতাতে আমাকে একটা খবর পাঠাতে হবে। তার আগে তোমাকে আমি কিছুই বলতে পারচি নে। এটা যদি কেবল আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'তো...'

'আমাকে আর কিছু বলার তোমার দরকার নেই।' অসীমা গম্ভীর

কণ্ঠে ঈষৎ আহতভাবে কহিল। 'সমস্ত দায়িত্ব থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে গেলাম। আমার যা অপরাধ তা ক্ষমা করো। এবার আমি যাই…'

অজিত একবার অসীমাকে অনুসরণ করিতে গেল। কিন্তু নিরস্ত হইয়া ম্যাগ্নোলিয়া গাছের ছায়ায় ভূতের মতো নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অসীমা একবারও পিছনে তাকাইয়া দেখিল না। তার অপস্রয়মান মসিমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া অজিতের দুই চোখ যেন করুণ অবসাদে জড়াইয়া আসিল

চৌদ্দ

কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড যেখানে ময়দানের দিকে আগাইয়া আসিয়া চৌরঙ্গির সঙ্গে ধাক্কা লাগাইয়াছে, তার দু-তিনখানা বাড়ি পূবে বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় কে, এন, রায়ের প্রাসাদের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি। ইহার বিশেষ স্থাপত্যভঙ্গি, ইহার লাল-পাথরের গাঁথুনি, ইহার রঙিন কাচের প্রকাণ্ড জানালাগুলি সবই মহার্ঘ্যতার পরিচয় দেয়। প্রকাণ্ড তেতলা দালানের মাপে সামনে মস্ত বড় লন্; পিছনে মস্ত বড় ফলের বাগান। লাল অ্যাস্ফাল্টের রাস্তা গাড়ি-বারান্দার ভিতর দিয়া প্যারাবোলার আকৃতিতে সমুখের দুই প্রান্তের দুই গেটে পৌঁছিয়াছে। গেটের ধারে দারোয়ানদের রৌদ্র বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য পাহারার ঘাঁটির ধরণে দুইটি কুঠরি। লনের পশ্চিম প্রান্তে দোতলা অফিস-বাড়ি। এটা সরকার মশায়ের রাজত্ব। পিছনে বাগানের একপ্রান্তে গোটা চারেক মোটরের উপযুক্ত গ্যারাজ; অফিস-বাড়ির সামনে দাঁড়াইলেই এগুলি নজরে পড়ে। তার পরেই চাকর বাবুর্চ্চিদের ঘরগুলি বাগানের গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে।

বড় দালানের দোতলার পূর্ব্বপ্রান্তের অতি পরিচ্ছন্ন চেহারার বড়ো ঘরটি বাড়ির গৃহিণী সুনলিনী দেবীর শয়নঘর। মার্ব্বেলের মেঝে, ফিকে নীল রঙের দেওয়াল। এটি বাড়ির সেরা ঘর। বাড়িতে অনুরূপ আরও একটি ঘর আছে; ঠিক এই ঘরের উপরে, তেতলায়। কিন্তু তেতলাটা এখন আর ব্যবহার হয় না। দৈনিক কর্ত্তব্য হিসাবে

চাকরেরা তেতলার গোটা দশেক ঘর ও অনেকগুলি বারান্দা ঝাড়-পোঁছ করে মাত্র। ওগুলি একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিলেও কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। ইহা লইয়া অন্যান্য বহু ক্ষোভের মতো সুনলিনী দেবীর একটা ক্ষোভ আছে।

বেলা চারটে। নভেম্বর মাসের সূর্য্য ইতিমধ্যেই অনেকটা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। সুনলিনী দেবী দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের শেষে হাতে মুখে জল দিয়া শোবার ঘরের সম্মুখের দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া একটি বেতের চেয়ারে বসিয়াছেন। সঙ্গিনী ও নার্স জ্ঞানদা এক গেলাস ফলের রস লইয়া হাজির হইয়াছে।

'ওটা এখন থাক, জ্ঞানদা,' সুনলিনী ক্লান্তভাবে কহিলেন: 'তুই বরঞ্চ অজিতের চিঠিটা এনে আর একবার আমায় পড়ে শোনা। কি এলোমেলো অস্পষ্ট চিঠিই সে লিখতে পারে!'

'আপনি এটুকু খেয়ে নিন্, দিদি। চিঠি এনে আবার আমি পড়ে শোনাচ্চি।' বলিয়া জ্ঞানদা কাচের গেলাসটা সুনলিনীর হাতে গুঁজিয়া দিল। কাঁধের ভাঁজ-করা তোয়ালেটা হাতে আগাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত রহিল।

সুনলিনী কিন্তু তৎক্ষণাৎই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন না। কহিলেন, 'একবার লেখার ছিরি দেখ! "মা, এবার হয় তো তোমার আফ্‌শোষটা পুরোপূরিই দূর করে দেব!" বলতো, জ্ঞানদা এর আমি কি মাথামুণ্ডু করি? এর কি যে অর্থ, আর কি যে অর্থ নয়, তা বোঝা দেবতার অসাধ্য! এতে আমি কি বুঝি বল্? এই যে আমার এত বড় বাড়ি-ঘর খাঁ খাঁ করচে, একটা ছোট ছেলেপুলে নেই, একটু হাসি গোলমাল নেই, গোরস্থানের মতো সারা

বাড়ি থম্ থম্ করচে, সে কি ইচ্ছে করলে এ দুঃখ দূর করতে পারে না? দুঃখ পেয়েচিস্ বলে সেই দুঃখকেই কি কায়েমি করে রাখতে হবে? বাপ-পিতামো পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতি কি কোনও কর্ত্তব্য নেই? এই শূন্য বাড়িতে আমিই বা কি নিয়ে থাকি বল্? দু-দশ গণ্ডা ছেলেপুলে থাকলে তবেই যে এত বড় বাড়িতে মানায়, একটা নাতির মুখ দেখতেও কি আমার ইচ্ছে করে না, জ্ঞানদা?'

'তা তো ঠিকই বলেছেন, দিদি,' জ্ঞানদা সায় দিয়া কহিল। 'জোর করে তো বলতে পারিনে, কিন্তু চিঠির ভঙ্গি দেখে যেন মনে হচ্চে, আপনার এই কষ্ট এইবার দূর হতে পারে।'

'তোর কথাই ঠিক হোক্, জ্ঞানদা,' সুনলিনী বেশ একটু চঞ্চল হইয়া কহিলেন। 'কিন্তু আমার তো ভরসা হয় না। সে কি সত্যই মায়ের দুঃখটা বুঝবে! যদি বুঝবেই, তবে এমন করে আধখানা করে চিঠি লেখা কেন? একটু স্পষ্ট করে কি সে লিখতে পারে না! এ যদি সত্যি হয়, এর চেযে বড সুখবর আর কোনটা? অথচ আমার কাছেও সে তা খুলে লেখা দরকার মনে করলে না! ছেলের মা হওয়া যে কি দুঃখের, তা কে বুঝবে! বল্ দেখি একবার, কেন সে আমার কাছে আদ্দেকখানা ঢেকে রাখচে? কেন সে স্পষ্ট করে আমার কাছে সব খুলে লিখচে না? কেন সে…'

'বাঃ রে, একথা স্পষ্ট করে গুরুজনকে লিখতে লজ্জা করে না বুঝি। তাই তিনি আভাসে জানিয়েচেন, ক্রমে সবই জানতে পারবেন। আপনি এটুকু খেয়ে নিন্! চিঠিটা আমি এনে আবার পড়ে শোনাচ্চি…'

সুনলিনী এবার আর দ্বিধা করিলেন না, চিঠি শুনিবার বর্দ্ধিত

আগ্রহে গেলাসটা নিঃশেষ করিয়া জ্ঞানদার হাতে দিলেন, এবং তোয়ালেটা লইয়া মুখ মুছিয়া তাহা জ্ঞানদার হাতে ফিরাইয়া দিলেন। জ্ঞানদা আর বিলম্ব করিল না; শূন্য গেলাস ও ব্যবহৃত তোয়ালেটা ভৃত্যদের জন্য একদিকের টিপয়ের উপর সরাইয়া রাখিয়া চিঠি আনিবার জন্য সুনলিনীর শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল।

'মা!'

'কি রে, কেষ্ট?' সুনলিনী ফিরিয়া তাকাইয়া স্বামীর আমলের পুরাতন বেয়ারা কেষ্টকে আবিষ্কার করিয়া কহিলেন।

'চৌধুরি মেম-সাহেব এসেচেন, মা। তাঁকে এখানে নিয়ে আসব কি?'

'এসেচেন! হ্যাঁ, আনবি বৈ কি। এখানেই নিয়ে আয়। ও জ্ঞানদা, শুনচিস?'

'দিদি!' ঘর হইতে জ্ঞানদা সাড়া দিয়া কহিল।

'যা তো বাছা, মিসেস্ চৌধুরি এসেছেন; একবার এগিয়ে তাকে নিয়ে আয় তো. বাছা। দার্জ্জিলিঙ থেকে এরই মধ্যে ফিরে এলেন! ভালোই হয়েচে। এরই কাছে অজিতের খবর পাওয়া যাবে। কবে আসবে, কেমন আছে, সবই ইনি বলতে পারবেন।...'

'যাচ্ছি, দিদি,' বলিয়া জ্ঞানদা বাহিরে আসিল।

আধ ঘণ্টা পরে। সৌদামিনী চা এবং চায়ের আনুষঙ্গিকগুলি শেষ করিয়াছেন। শমিতাকেও লইয়া আসিবেন ঠিক ছিল। সাজ-পোশাক করিয়া সে তৈরিও হইয়াছিল। এমন সময় মুখপোড়া নন্দ মুস্তফি কোথা হইতে অকস্মাৎ আসিয়া হাজির হইল। অতিথি-

সৎকারের অজুহাতে মেয়ে আর কিছুতেই সঙ্গে আসিতে রাজি হইল না। সৌভাগ্যক্রমে স্বামী বাড়িতেই ছিলেন। তাহাকে দুই জনের উপর কড়া নজর রাখিতে বলিয়া সৌদামিনী অজিতের মাকে পুত্রের খবর দিয়া আশ্বস্ত করিতে আসিয়াছেন।

তাহার এই সৎকার্য্যের ফল যে সত্যসত্যই ফলিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। তিনি নিজে যে-পরিমাণ প্রফুল্ল এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন, সুনলিনী সেই পরিমাণ গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন।

'সে মেয়ে কি তোমাদের ঘরে মানায়, দিদি। সে এক চোয়াড়! যেন সেপাই।' সৌদামিনী কহিতে লাগিলেন। 'না আছে ছিরি-ছাঁদ, না আছে একটু মোলায়েম ভাব। চিরকাল যে মাস্টারনিগিবি করে এসেচে, তার কি মেয়েত্ব কিছু থাকে? সোহাগ করে একদিন আমার হাত চেপে ধরেছিল, সত্যি বলবো কি দিদি, মনে হলো, উখোর ঘষা খেয়ে বুঝি চামড়াই উঠে আসে! সারাদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলার রগ ফুলে উঠেচে; চোয়ালের হাড় এই উঁচু। খোঁপা এসে ঠেকেচে ব্যাঙাচির লেজে। যেন ছ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়া! বল্‌লে বিশ্বেস করবে না, ভাববে বাড়িয়ে বল্‌চি। কিন্তু এর একবর্ণও বাড়োনো নয়। তুমি বলতে পার, এমন মেয়েকে অজিতের মতো রাজপুত্তুর ছেলে পছন্দ করলে কি করে? আমিও তো তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু তখন কি অতশত জানি!'

'বলো ভাই, সব খুলেই বলো।' সুনলিনী গম্ভীর চিন্তিতভাবে কহিলেন।

'কি বল্‌বো দিদি, শুনলুম, এই নাকি দাদু আর নাতনীর পেশা। বাইরের লোক আমরাই জান্‌তুম না, নইলে সারা দার্জ্জিলিঙের লোক

এ-খবর জানে। দাদুর ইস্কুল টাকার অভাবে বন্ধ হওয়ার জোগাড়। অথচ ভড়ং রাখ্‌বার শখ পুরামাত্রায়। প্রতি 'সীজনে'ই দাদু ইস্কুলের নাম করে' শাঁসালো দেখে কাউকে না কাউকে ডেকে আনে। ডেকে এনে, এই নাতনীকে লেলিয়ে দেয়! টাকা আসে, ইস্কুলের খরচ চলে যায়। কি বলব দিদি, একথা তোমাকে বলতেও লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাচ্ছি! অথচ একজন দুজন নয়, দু-দশ গণ্ডা লোকের কাছে আমি ঠিক এই একই কথা শুনেচি। এরপর কি করে' অবিশ্বাস করি বলো? কিন্তু ঐ ঢলাঢলি পর্য্যন্তই। তার বেশি কেউই এগোয় না। অনেককেই গাঁথতে চেয়েচে; কিন্তু যারা কাছে এগিয়ে গিযেচে, তারাও তেমনি লোক। সময় মতো তারাও সবাই সরে পড়ে। কিন্তু তোমার ছেলে তো তেমন নয। সে ভাল ছেলে। অতশত ফন্দি-ফিকির বোঝে না; সরল বিশ্বাসে জগৎটাকে নিজেরই মতো সরল মনে করে। আর এই হয়েচে তাদের সুযোগ। এই সুযোগে…'

'মা!'

'আবার কি রে, কেষ্ট?' সুনলিনী ব্যস্তসমস্তভাবে দৌড়াইযা-আসা কেষ্ট বেয়ারার দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন।

'টেলিফোনে ট্রাঙ্ক কল্ এসেচে, মা, দার্জ্জিলিঙ থেকে। আপনি আসুন।'

'ট্রাঙ্ক কল! দার্জ্জিলিঙ থেকে? বল্, আমি আসচি।' বলিয়া সুনলিনী ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইযা পড়িয়া দ্রুতপদেই হল্-ঘরের দিকে যাত্রা করিলেন। উত্তেজনায় উদ্বেগে তাঁর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

'কে? অজিত। কি খবর, বাবা?' রিসিভারটা কানে চাপিয়া সুনলিনী সভয়ে প্রশ্ন করিলেন। 'যাক্, বাবা বাঁচালি, ভয়ের কিছু নয়। কি কথা জিজ্ঞেস করবি বল্?'

কয়েক মিনিট ধরিয়া নির্ব্বাক ভাবে রিসিভারটা কানে চাপিয়া তিনি দার্জ্জিলিঙ-প্রবাসী পুত্রের বক্তব্য শুনিলেন। তারপর কহিলেন, 'এ অসম্ভব! এ হ'তে পারে না, অজিত। এ-মেয়ে সম্বন্ধে অনেক কথা আমি শুনেচি। এ মেয়ে মোটেই আমার পছন্দ নয়। একবার আব্দার শুনে মরি! তিনি দয়া করে' আমার ছেলেকে বিয়ে করবেন, কিন্তু আমার বাড়িতে এসে থাকতে পারবেন না। আমরা মায়েতে-ছেলেতে দার্জ্জিলিঙ গেলে তবেই তার সঙ্গে আমাদের দেখা হতে পারবে! ধৃষ্টতার একটা মাত্রা থাকা উচিত! না, আমি রাগচি না, বেশ বিবেচনা করেই বলচি। এর অর্থ যদি এই না হব, তবে আর কি শুনি? না, অজিত, এতে আমি মত দিতে পারব না।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বেশ মনে আছে। যেখানে ইচ্ছে, যাকে ইচ্ছে তুই বিয়ে করলেই আমি খুসি হবো। কিন্তু তোকে আমি এখানে বিয়ে করতে নিষেধ করচি।···এর কারণ আছে, কিন্তু তা এখন আমি বলতে পারব না। কিন্তু তোর হিতের জন্যই···তুই জানিস্ না···কিন্তু সে কথা যাক্···আমার এই শূন্য বাড়ি কি তোর বিয়ের পরও এমনি শূন্যই পড়ে থাকবে? তবে তোর কাছে এত দিন আমি কি চেয়ে এসেচি? এমনি করেই কি তুই আমাকে হতাশ করবি? না, কিছুতেই নয়। জোর করে' তো আমি কাউকে বাধা দিতে পারিনে, কিন্তু অনুমতি আমি কিছুতেই দিতে পারব না।··· তুই চলে আয়, অজিত। ওখানে আর একদিনও থাকিস্ নে। কালই চলে আয়। আর এক মুহূর্ত্তও দেরি করিস্ নে। আর দেরি হলে উদ্বেগে আশঙ্কায় আমি মরে যাব।···হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো···' কিন্তু তখন দার্জ্জিলিঙের আহ্বারক টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়াছে।

পনেরো

ইহার পর দিন দশেক গত হইয়াছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইতে চলিল। দার্জ্জিলিঙের বায়ু-পরিবর্ত্তনকারীদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে পাহাড় ছাড়িয়াছে। অবশিষ্টেরাও প্রতিদিনই এই শৈল-নগরীর লোক-সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। পার্ব্বত্য ট্রেন, ট্যাক্সি এবং মোটর বাস্‌-এ করিয়া শীত-শঙ্কিতদের ইভাকুয়েশন পূরাদমেই চলিতেছে। তাপমান যন্ত্রে পূর্ব্বদিনের উর্দ্ধতম তাপের অঙ্কটা পরের দিন নিয়মিত ভাবে নামিয়া আসা শুরু করিয়াছে। কন্‌কনে বাতাসে আসন্ন শীতের অভ্রান্ত পূর্ব্বাভাস। প্রত্যহই চক্‌চকে রৌদ্র উঠিতেছে; কাঞ্চনজঙ্ঘা শাদা এবং রঙিন জামা গায়ে প্রতিদিন প্রভাতেই নিয়মিত ভাবে দেখা দিতেছে, একদিনও কামাই করিতেছে না। দার্জ্জিলিঙ শীত-কালীন তুষারপাত, বৃষ্টি, রৌদ্রাভাব এবং লোকাভাবের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শীঘ্রই দার্জ্জিলিঙের ইস্কুলগুলির ছুটি হইবে; শীতের অবকাশে ছাত্র-ছাত্রীরা সমতল-ভূমির আশ্রয়ে পালাইয়া অতি-শৈত্যের প্রকোপ এড়াইবে।

অন্যান্য ইস্কুলগুলির মতো 'অরুণাচলে'ও এ-সময়ে ছুটি হয়, তবে যে-সব ছাত্রছাত্রীর যাইবার মতো জায়গা নাই, তারা এখানেই থাকিয়া যায়। নিয়মিত ক্লাস বসে না, কিন্তু অসীমা নিজে দিনের কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহাদের পড়ায়, এবং পড়ার চেয়ে শিশুদের কাছে যা ঢের বেশি লোভের, নানা গল্প বলে, নতুন খেলা শেখায়, নতুন গান শেখায়।

পাখির বাসা

এই শীতকালীন অবকাশ অসীমা এবং তার দাদুর পড়িবার পক্ষে সব চেয়ে বড় অবসর। অন্যান্য বছর এই সময়ে দাদু-নাতিনীতে মিলিয়া মহা উৎসাহ সহকারে নতুন বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করে, এবং কলিকাতা, বোম্বাই অথবা বিলাতের গ্রন্থ-প্রকাশক এবং গ্রন্থ-বিক্রেতাদের সাথে চিঠি লেখালেখি শুরু করে।

এমন উত্তেজনাপূর্ণ কাজেও এবার অসীমার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। সকল উৎসাহ এবং উত্তেজনা যেন দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের বায়ু-পরিবর্ত্তনকারীদের মতো অতি অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে অজিত তার সাথে আব দেখা করে নাই। ছোট একটি চিঠি পাঠাইয়া সে দূর হইতেই চলিয়া গিয়াছে! মাত্র ক'টি লাইন! লাইন কযটা অসীমার মুখস্ত হইয়া গিয়াছে: "তোমাকে মুখ দেখাবার মতো আমার সাহস নেই। দূর থেকেই পালিয়ে গেলাম। যাতে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারতাম, আমার মাকে তাতে রাজি করানো গেল না! . এটা আমারই দুর্ভাগ্য। যে ব্রত-সাধনায় তুমি আত্মনিয়োগ করেচ, তার আগুনে আমার অপরাধ তুচ্ছ আবর্জ্জনার মতো তুমি বিসর্জ্জন দিতে পারবে। কিন্তু নিজেকে আমি কোন্ সান্ত্বনা দেব? কি আমাব রইল?"

চায়েব সমব হইয়াছে। ছেলেমেয়েদের ডাকিতে পাঠাইযা অসীমা নিজে দাদুর কাছে লাইব্রেরি-ঘরের দিকে রওনা হইল। আজকাল প্রায়ই তিনি চায়ের টেবিলে আসেন না; লাইব্রেরিতেই চা দিতে হয়। কেমন যেন মুষ্ড়াইয়া পড়িয়াছেন! কিন্তু অসীমা নিজে যে তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবে, এমন উৎসাহ সংগ্রহ করিতে পারে না। বাড়িতে একটা বড়ো রকম বিপদ বা দৈব-দুর্ঘটনা হইয়া গেলে বাড়ির

প্রত্যেকের মনেই যেমন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সারা 'অরুণাচলে'ই যেন সে রকম অবসাদকর একটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বাচ্চা ছেলেপুলেগুলি পর্য্যন্ত কেমন যেন গম্ভীর-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

'হ্যালো, এটা কোন্ জায়গা ? এটা কলকাতা ? অজিতদার বাড়ি ?'

অসীমা হল-ঘরটা পার হইতেছিল, এক প্রান্ত হইতে উপরোক্ত অদ্ভুত জিজ্ঞাসাটি শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, ফায়ার-প্লেসের সামনে বৃহৎ ঘরটির অপরাপর অংশকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া টুটু কানের উপর বাঁ হাতের মুঠো চাপিয়া ধরিয়াছে, এবং কনুইয়ের উপর মুখ লইয়া টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

'এটা অজিতদার বাড়ি তো ? হ্যালো, কে কথা বল্‌চ ? অজিতদা ! আমি টুটু। বেশ লোক বাবা তুমি ! আমাদের না বলেই চলে গেলে ? আমরা তো তোমার সঙ্গে কথা বলবই। কানুর কথা আমরা আর মোটেই শুনব না।···ময়না তোমাকে টেলিফোন করতে বল্লে বলেই তো তোমাকে টেলিফোন করচি।···দুষ্টুমি করেছিল বলে বাদলের খুব জ্বর এসেছিল। এখন ভালো হয়ে গেচে। সে আর কখনো অমন করবে না বলেচে। সে নাকে খৎ দিয়েচে। বাদল তোমাকে খুব ভালোবাসে। এইবার তুমি চলে এসো। আর আসার সময় একটু বেশি ক'রে বাগবাজারের চকোলেট নিয়ে এসো, আচ্ছা ?···'

অসীমা পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া গেল। অজিতদা আর যে কখনও ফিরিয়া আসিবে না, এ কথাটা উহারা এখনও টের পায় নাই। কিন্তু কি লাভ ভুল ভাঙাইয়া ? শিশুদের স্মৃতি প্রখর নয়। ক্রমে ইহারা তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। আর তাহার কাছে কাল্পনিক টেলি-

ফোনের ডাক পাঠাইবে না। অসীমাও ভুলিবে কি? কর্ত্তব্যের দাবির মধ্যে অজিতের কথা চাপা পড়িতে কি অনেক দিন লাগিবে?

'এখনও তুমি লিখচ, দাদু! চারটে বেজে গেছে। চা খাবে না?'

ডাঃ সেন লেখার টেবিল হইতে মুখ তুলিয়া নাতিনীকে দেখিলেন। একটা ফিকা হাসিতে মুখমণ্ডল যেন অনেকটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। চশমা খুলিয়া চিঠির কাগজের উপর রাখিয়া তিনি কহিলেন, 'বলিস্ কি রে, দিদিমণি? এরই মধ্যে চারটে বেজে গেল? এতক্ষণে একটা চিঠিও সারতে পারলাম না। ক্রমেই একেবারে অথর্ব্ব হয়ে পড়চি...'

'তুমি কি চায়ের টেবিলে যাবে, না এখানেই চা এনে দেব?'

'দেখ্ দিদিমণি, আমার মনে হচ্চে, এবার সত্যই আমি বুড়ো হয়ে উঠেচি। ছেলেপুলেদের চেঁচামেচিতে হঠাৎ যেন বিরক্ত বোধ করা শুরু করেচি। সব কিছুতেই বিরক্ত হয়ে উঠচি। এ তো আমার স্বভাব নয়। এইবারই শেষের ঘণ্টা বেজে উঠবে, কি বলিস্?'

'নাও, দাদু। ওসব বাজে কথা তোমাকে বলতে হবে না।... অতো বড়ো চিঠি তুমি কাকে লিখচো?...'

'অজিতের সেই চিঠিটারই একটা জবাব দিয়ে দিচ্চি। আর ফেলে রাখা ভালো দেখায় না, দিদিমণি।' ডাঃ সেন যেন একটু দ্বিধার সঙ্গে কহিলেন। 'সে খুব ব্যথা পাবে, কিন্তু তুই যে দিদিমণি কিছুতেই রাজি হোস্ না। এখনও ভেবে দেখ, দিদিমণি। ধনীদের কাছ থেকে ইস্কুল-ফণ্ডে আমরা সাহায্য গ্রহণ করে' থাকি জেনেই সে ইস্কুল-ফণ্ডে দশ হাজার টাকার এই চেক্ পাঠিয়েচে। বিশেষ করে' তার দানটাই প্রত্যাখ্যান করলে, সে স্বভাবতই আঘাত পাবে। ভাববে, আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা অতি নিকট ও গভীর হ'তে পারত, তা সম্ভব না

হওয়ায় অভিমান-বশতই তাকে আমরা আঘাত করচি।...তার দান ফিরিয়ে দিতে এখানেই আমার সঙ্কোচ। এ আমার বুড়ো বয়সের লোভ নয়, দিদিমণি। কি রকম অনুনয়ের সুরে তার চিঠিটা লেখা, লক্ষ্য করেচিস তো, দিদিমণি? প্রত্যাখ্যান আসতে পারে, এই আশঙ্কায় সে যেন আগে থেকেই তটস্থ হয়ে আছে!...'

'তা হোক্, তুমি চেক্ ফিরিয়ে দাও।'

'বস্, দিদি, আমার কাছে একটু বস্। বাচ্চাদের দুধ নানীই দিতে পারবে। এ-চিঠি শেষ করার আগে তোর সাথে আমি দুটো কথা বলে নিই।...এই খেলাঘর আমি একদিন তোরই মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি করেছিলাম। তুই সুখী হবি, সারা জীবন এইটেই আমার কাছে বড়ো কথা ছিল। আমার সেই আশা সার্থক হওযার উপক্রম হ'তে দেখে আমার জীবনের সকল দুঃখ যেন সার্থক হয়ে ওঠবার...'

'না, দাদু, তোমার এই খেলাঘর আমার সুখ-সুবিধার চাইতে, কোনও একজনের স্বার্থের চাইতে, অনেক বড়ো, অনেক বেশি দামি। এই খেলাঘরের খেলা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, এর এতগুলি কচি মুখের হাসি আর সুখ অটুট রাখবার জন্য মাত্র একজনের সুখকে অনায়াসেই বিসর্জ্জন দেওয়া চলে। আর তার সুখেরই বা অভাব কোথায়? এমন একটা প্রতিষ্ঠানের সেবা করতে পারা, এতগুলি শিশুর এত ভালবাসা পাওয়া, এ কি কম সার্থকতা? এ নিয়ে তুমি আক্ষেপ করো না, দাদু। তোমার এই 'অরুণাচলে'ই আমার কাজ, আমার সার্থকতা, আমার আনন্দ।'

'কিন্তু ইস্কুল তুই কতদিন চালু রাখতে পারবি, দিদিমণি? টাকার অভাবেই যে তোর ইস্কুল অচল হয়ে উঠবে?...'

'আমি টাকা নিয়ে পড়াব, দাছু! যারা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য টাকা ব্যয় করতে পারে, তাদের কাছ থেকে দক্ষিণা নেওয়ায় কোনও দোষ নেই। তুমি আমাকে মাত্র এ অনুমতি দাও। শুধু এই অনুমতি দাও। একবার দেখো, তোমার ইস্কুল আমি কত মজবুত করে...'

'ওহে, মহেন্দ্র, এদিকে চেয়ে দেখো! দেখো, কাকে নিয়ে এসেচি!'

দরজার কাছ হইতে একটা পরিচিত গলার আওয়াজ শুনিয়া ডাঃ সেন এবং অসীমা তুজনেই সচকিত ভাবে সেদিকে তাকাইল। দেখিল, বাঁদর-টুপিতে পুনঃশোভিত রায়বাহাতুর কুমুদ চৌধুরি সন্ত্রান্ত চেহারার একজন অপরিচিতা প্রৌঢ় বিধবা ভদ্রমহিলাকে লইয়া হাস্য-উদ্ভাসিত মুখে ভিতরে পা বাড়াইয়াছেন।

'ইনি অজিতের মা,' রায়বাহাতুর মহিলার সম্মানে দাঁড়াইয়া-ওঠা ডাঃ সেনকে কহিলেন। 'তোমার সাথে দেখা করতে এসেচেন।'

বিস্ময়ে ডাঃ সেনের তুই চোখ পূর্ণ হইল। ব্যাপারটা এতই অভাবনীয় যে, উপলব্ধি করিতে কয়টা সেকেণ্ড পার হইয়া যাব। জোড় হস্তে নমস্কার করিয়া বৃদ্ধ প্রায় উত্তেজনা-স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন, 'আসুন। বসুন। চেয়ারটা এগিয়ে দে, দিদিমণি। বসো কুমুদ। আপনি কবে এলেন? অজিত কি...'

'আমি আজকেই এসে পৌচেছি, সেন-মশায়!' অসীমার আনম্র মুখের দিকে একবার বেশ ভালো করিয়া তাকাইয়া লইয়া সুনলিনী আগাইয়া-দেওয়া চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন এবং ডাঃ সেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'খুব বেশি দেরি করে ফেলেচি কি, সেনমশায়? নিজের দোষ বুঝতে পারলে যত শীগগির সম্ভব তা স্বীকার করে'

প্রতিকারের চেষ্টা করতে হয়, এ-কথা আমার স্বামীর কাছে শিখেচি। এ-শিক্ষা আজ পর্য্যন্ত কখনই আমি অবহেলা করিনি। ইদানীং আমি মস্ত একটা অপরাধ করে' ফেলেচি। অপরাধ যেমন আপনাদের কাছে, তেমনি আমার নিজের ছেলের কাছেও। পাঁচজনের কথায় কান দিয়ে আমি অন্যায় আচরণ করেচি। এই ত্রুটি-সংশোধনের জন্যই আপনার কাছে আমাকে ছুটে আসতে হলো···'

'সে কি কথা! আমি যে খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়চি।' কথার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ডাঃ সেন বিব্রতভাবে কহিলেন। 'আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না। অজিত কি কিছু আপনাকে···'

'অজিত যখন বাড়ি ফিরে গেল,' অসীমার দিকে আর একবার দ্রুত তাকাইয়া লইয়া সুনলিনী কহিলেন, 'সব কথাই তার কাছে শুনলাম। বুঝতে পারলাম, আপনাদের সম্বন্ধে পাঁচজনে আমাকে যে খবর দিয়েছিল, তা কত বড় অসত্য। তারা ইচ্ছা করে' নিন্দা রটিয়েচে; হিংসে করে' ক্ষতি করতে চেয়েচে। আর ঐ সঙ্গে এ-ও বুঝলাম, নতুন করে' আবার আমার সংসার গড়ে তোলবার যে-আশা এত দিনেও ছাড়তে পারিনি, একমাত্র আমার জেদের জন্যই হাতে পেয়েও তা হারাতে বসেচি। অজিত আমার কি যে জেদী ছেলে তা তো আপনারা জানেন না।···বুঝলাম, ভুল করেচি। অপরাধ করেচি। তাই তাকে গিয়ে বল্লুম, "হ্যারে, সবই যেন হলো, কিন্তু তোর বিয়ের পরও আমার বাড়ি কি শূন্যই পড়ে থাকবে, এমনি খাঁ খাঁ করবে? এ যে আমি ভাবতে পারিনে। আমার সব সাধ-আহ্লাদ কি এমনি করেই চূর্ণ করবি?···এক কাজ করলে হয় না? ঘরগুলি তো আমাদের সব খালিই পড়ে আছে।

তাঁদের 'দিদি'র সঙ্গে বাচ্চাগুলিকেও এখানে নিয়ে এলে হয় না? এ-ব্যবস্থা হলেও কি আমার মা এখানে আসতে রাজি হবে না?" সে কি বল্‌লে, জানেন? সে বল্‌লে, "এ-প্রশ্ন তাকেই জিজ্ঞেস ক'রো। তাকে ছেড়ে থাকতে তার ইস্কুলের বাচ্চাদের কষ্ট হবে, তার আপত্তি তো এই।"...তাই ছুটে এলাম জিজ্ঞেস করতে।' বলিয়া এইবার স্নেহনলিনী পাশে নত-মুখে দণ্ডায়মান অসীমার দিকে স্পষ্টভাবে স্নেহউদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাহিলেন। কহিলেন, 'আমাকে আর দুঃখ দিস্‌নে, মা। তোর সব বাচ্চা বজ্জাতগুলিকে আমি কলকাতা নিয়ে যাব। শীতে কলকাতা, আর গ্রিষ্মিতে দার্জ্জিলিঙ পাহাড়—ডাঃ সেনের ইস্কুলের এই দুই অধিবেশন! বল্‌ মা, এতে চলবে কি? শূন্য বাড়িতে আমি যে একা একা আর থাকতে পারি নে, মা!...বাঃ, এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে!' বলিয়া প্রণতা অসীমাকে নিচে হইতে উঠাইয়া তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তার মুখ-চুম্বন করিলেন। অশ্রুতে তার দুই চোখ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তারপর ডাঃ সেনের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, 'ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল, তা-ঐ মশায়। এতে আপনি আপত্তি করতে পারবেন না। আপনাকেও আমরা শীতকালে কলকাতায় নিয়ে যাব...'

'ওরে সর্ব্বনাশ!' ডাঃ সেন অশ্রু-উজ্জ্বল চোখে সহাস্যেই কহিলেন, 'তবে দিদিমণির পাহাড়ী খেলাঘর পাহারা দেবে কে? এ ভারটা আমার। নইলে দিদিমণি আমার রাগ করে' বিয়ে না ভেঙে দেয়...'

কুমুদ চৌধুরি এতক্ষণ নির্ব্বাক দর্শক হিসাবে বসিয়াছিলেন, এইবার বাঁদর-টুপি খুলিয়া কহিলেন, 'দিদিকে চটাতে আমিও পরামর্শ দেব না হে, মহেন্দ্র। সামান্য মতানৈক্যে আমার ঘটক-বিদায়টা মারা পড়বে, এ কোনও কাজের কথা নয়। তুমি পাহাড়ে বসেই নির্ব্বিঘ্নে পড়াশুনো ক'রো।...

উঃ! কি করে যে শীতের দার্জ্জিলিঙে মানুষে বাস করে! এরই মধ্যে আমার হাড়-কাঁপুনি শুরু হয়েচে। ওরে, বাস্ রে...'

সহসা বাহিরে চেঁচামেচির একটা প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হইয়া গেল। 'অরুণাচলে'র ক্ষুদে বাসিন্দারা একযোগে খানা-কামরা হইতে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া বাহিরের লন্‌-এর একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল, 'অজিত-দা', 'অজিত-দা'!

এক সঙ্গেই একশোটা প্রশ্ন হইল। 'কোথায় গিয়েছিলে, অজিতদা?' 'এত দিন আসনি কেন, অজিতদা?' 'আমি তো তামাসা করেছিলাম, অজিতদা। তুমি কি রাগ করেছিলে?' এই শেষের প্রশ্নটি বাদলের।

'তোমার হাতে ওটা কি, অজিতদা?' টুটু অজিতের বগলে একটা মোটা চেহারার বাণ্ডিল আবিষ্কার করিয়া স-লোভে প্রশ্ন করিল। 'ওতে কি আছে?'

'ওতে অনেকগুলি কানমলা আছে', অজিত বাণ্ডিলটা হাতে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল। 'সেবারে তোমরা আমার সঙ্গে আড়ি করেছিলে, মনে নেই? আমি ভয়ানক রেগে আছি। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা করে কানমলা এনেচি! নেবে?...'

'দাও।' কানু আগাইয়া আসিয়া কহিল। 'দেখি, কেমন কানমলা আছে!'

অজিত আর বাক্যব্যয় করিল না। বাণ্ডিল খুলিয়া রৌদ্রের কাপড় হাওয়ার দৌরাত্ম্য হইতে বাঁচাইবার জন্য কাঠের যে ছোট ক্লিপ্‌গুলি ব্যবহার করা হয়, তাহার এক গাদা বাহির করিল, এবং বিস্মিত বাচ্চারা কাণ্ডটা বুঝিবার পূর্ব্বেই উহার একটা দুই আঙুলে তুলিয়া লইয়া

চট্ করিয়া ঝগড়াবাজ কানুর কানের ডগায় আটকাইয়া দিল। কানু এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; ক্লিপ্ ধরিয়া সে টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু সহসা খুলিতে পারিল না। তাহার দুর্গতিতে তাহার বন্ধুরা আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল।

অজিত কহিল, 'এসো। সবাই একে একে এগিয়ে এসো।'

এক এক করিয়া প্রত্যেকেই আগাইয়া আসিল: টুটু, ময়না, বুলু, ডলী, ইনু, শিবু, তাতা, গণু, নন্তু, বাদল কেহই বাদ রহিল না। এক একটা করিয়া কাঠের ক্লিপ্ কানে পরিয়া তাহারা আহ্লাদে আকর্ণবিস্তৃত হাস্য করিতে লাগিল। এ যেন একটা প্রকাণ্ড মজা হইতেছে।

'উপহার পেয়ে পেয়ে', অজিত কৃত্রিম ভৎর্সনার সঙ্গে কহিল, 'তোমাদের আব্দার অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল! এই তার শাস্তি।'

'আর আছে? আমাকেও একটা দাও।'

কণ্ঠস্বর শুনিয়া অজিত তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরিল। দেখিল, ঠিক পিছনেই অসীমা সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

'অসীমা!' অজিত দীপ্ত মুখে কহিল।

'একটা ক্লিপ্ দাও দেখি।' বলিয়া অজিতের হাতের বাণ্ডিল হইতে একটা ক্লিপ্ উঠাইয়া লইয়া অসীমা নিজেই তাহা নিজের কানে পরিল। কহিল, 'আমারও কান-মলা প্রাপ্য হয়েচে। আমার আব্দারও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।'

পলকে শিশুদের হাসি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। এমন মজার ব্যাপারও কি কেউ কল্পনা করিতে পারে! কাণ্ড দেখ! দিদির কানেও একটা! হো-হো, হা-হা, হি-হি শব্দে পাহাড় এবং উপত্যকা, ঝরনা এবং পাইন-বন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তুষার পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় এ হাসি গিয়া

ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। বুড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা তোব্‌ড়ানো গালের নানা জায়গায় সূর্য্যাস্তের রং লেপিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

এই হাসির হর্‌রা ভেদ করিয়া সহসা কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতি বাদলের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল: 'অ্যাটেনশন্। আইজ্ ফ্রণ্ট্। স্যালুট্।'